ইউনিট ১১

বাংলাদেশের অর্থনীতি (১৯৭১-২০০৮)

পাঠ-১ : বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো, বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও সমাধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্যসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পারবেন।

ভূমিকা :

বাংলাদেশে বি.বি.এস. এর তথ্যানুযায়ী বিগত কয়েক দশকের জিডিপি'র বৃদ্ধির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শত প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বিপর্যয়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থাকা সত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে ধারা সন্তোষজনক ভাবে অব্যাহত রয়েছে। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, ১৯৭২-৭৩ সালে কৃষির অবদান ছিল জিডিপি'র ৩৮.৬শতাংশ তা কমে ২০০৭-০৮ সালে দাড়িয়েছে জিডিপি'র ২০.৯ শতাংশে, অপর দিকে শিল্প ও সেবাখাতের অবদান ১৯৭২-৭৩ সালে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ১৫.৫ শতাংশ এবং তা বেড়ে দাড়িয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ২৯.৭ শতাংশে ও ৪৯.৫ শতাংশে।

বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো

কৃষি কাঠামো বলতে দেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবস্থান, গুরুত্ব, উৎপাদনের উদ্দেশ্য, ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা, খামারের আয়তন, উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে গঠিত কৃষি খাতের সার্বিক অবস্থাকে বুঝায়।

বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক দেশ হলেও এখনও এখানে চাষাবাদ মূলত জীবন-ধারন কেন্দ্রীক অর্থাৎ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ শুরু হয়নি বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সবেমাত্র শুরু হয়েছে। তাই বাংলাদেশের কৃষির কাঠামোকে সার্বিকভাবে সনাতনী কৃষি বলা যায়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ক্রমশ কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে শিল্পসমূহ ও অন্যান্য খাতের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে যা নিম্নের সারণীতে দেখানো হল।

সারণী- ১ ঃ জাতীয় আয়ে বিভিন্ন খাতের অবদান (%)

খাত	১৯৭২/৭৩	১৯৭৯/৮০	১৯৮৪/৮৫	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৮/৯৯	২০০৮/০৯
কৃষি	৫৭.৬০	৫৪.৫৮	৫১.১৯	৫০.০	৩১.৫	২১.০
শিল্প	১০.৪০	৮.৭০	৮.৪৬	১০.০	১১.২	১৭.৭৭
নির্মাণ	৩.৭	৫.৫৪	৪.৬৩	২.৬	৬.৩	৯.১৪
শক্তি ও গ্যাস	০.৩০	১.৮৫	০.৩৮	০.৮	১.৮	১.৫৬
গৃহায়ন	৪.৭০	৪.৫১	৬.১৩	৭.৭	৭.০	১৪.৯০
বাণিজ্য, পরিবহন, সাভিস, অন্যান্য	২৩.৮২	২৫.৮২	২৯.২১	২৯.৬	৩২.২	৩৫.০

উৎস ঃ বিবিএস, বিভিন্ন সনের অর্থনৈতিক জরিপ ও বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন।

বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১। দ্রব্যের ধরন ঃ বাংলাদেশে মূলত অর্থকরী ফসল এবং খাদ্য শস্য এই দু'ধরণের দ্রব্য বা পণ্য উৎপাদিত হয়। যেমন- পাট, আঁখ, চা, তামাক ইত্যাদি অর্থকরী ফসল। অপরদিকে ধান, গম, ফলমূল, ডাল, তৈল ইত্যাদি খাদ্যশস্য।

২। জীবন ধারন উপযোগী চাষাবাদ ঃ বাংলাদেশে এখনও বাণিজ্যিকভাবে মুনাফার লক্ষ্যে চাষাবাদ কার্যত শুরু হয়নি। চাষ মূলত জীবন ধারণ উপযোগী এবং পারিবারিকভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৩। খামারের আয়তন ঃ বাংলাদেশের কৃষি খামার বা কৃষি জোতের গড় আয়তন ২.২ একর। তবে বেশিরভাগ খামারই ক্ষুদ্র এবং পারিবারিক। নিম্নের ছক থেকে বুঝা যায় যে বাংলাদেশ একটি ক্ষুদে মালিক চাষীদের দেশ। বেশিরভাগ জমির মালিক ক্ষুদে চাষী নিজস্ব শ্রম দিয়ে অথবা ভাড়া শ্রম দিয়ে নিজস্ব জমিতে চাষ করে এবং ভরণ পোষণই তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে ফার্মের আয়তন অনুযায়ী ফার্মের ধরণ, সংখ্যা এবং মোট জমির পরিমাণ নিচের সারণীতে দেখানো হল ঃ

সারণী- ২ ঃ খামারের আয়তন, ধরণ, সংখ্যা

খামারের আয়তন (একর)	ধরণ	খামার সংখ্যা (হাজার)		খামারের সংখ্যা (%)	
		২০০৫	১৯৯৬	২০০৫	১৯৯৬
মোট খামার	মোট	১৫০৮৯	১১৭৯৮	১০০.০০	১০০.০০
.০৫-.৪৯ একর	প্রান্তিক	৫৮২৯	৩৩৫৬	৩৮.৬২	২৮.৪৫
.৫০-২.৪৯ একর	ক্ষুদ্র	৭৫২৩	৬০৬৭	৪৯.৮৬	৫১.৪২
২.৫০-৭.৪৯ একর	মাঝারি	১৫৬১	২০৭৮	১০.৩৪	১৭.৬১
৭.৫০-বেশী	বড়	১৭৭	২৯৮	১.১৭	২.৫২

উৎস ঃ বি বি এস বাংলাদেশ কৃষি নমুনা জরিপ ২০০৫ এবং কৃষি শুমারী ১৯৯৬

সারণী-২ থেকে লক্ষ্যনীয় যে, ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী প্রায় ৮০% খামার ছিল প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের হাতে এবং প্রায় ১৮% খামার ছিল মাঝারি কৃষকদের হাতে।

সারণী- ৩ ঃ খামারের আয়তন, ধরণ, জমির পরিমাণ, গড় খামারের আয়তন

খামারের আয়তন (একর)	খামারের ধরন	খামারের আয়তন পরিমাণ (হাজার একর)		মোট পরিমাণের (%)		খামারের গড় আয়তন একর	
		২০০৫	১৯৯৬	২০০৫	১৯৯৬	২০০৫	১৯৯৬
মোট খামার	মোট	২২৩০৭	১৯৯৫৭	১০০.০০	১০০.০০	১.৪৮	১.৬৯
.০৫-.৪৯ একর	প্রান্তিক	২৪৯৯	৮৯৫	১১.২০	৪.৪৮	০.৪৩	০.২৭
.৫০-২.৪৯ একর	ছোট	১০৮১৭	৭৩২৪	৪৮.৪৮	৩৬.৬৯	১.৪৪	১.২০
২.৫০-৭.৪৯ একর	মধ্যম	৬৭৩৭	৮২৮২	৩০.২০	৪১.৫০	৪.৩২	৩.৯৯
৭.৫০-বেশী একর	বড়	২২৫৩	৩৪৫৬	১০.১০	১৭.৩২	১২.৭৪	১১.৬০

উৎস ঃ বি বি এস, বাংলাদেশ কৃষি নমুনা জরিপ ২০০৫ এবং কৃষি শুমারী ১৯৯৬

অন্য দিকে সারণী- ৩ থেকে স্পষ্টত: দেখা যায় যে বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোর অন্য একটি দিক হল ভূমির মালিকানা বিন্যাসে অল্প সংখ্যক লোকের হাতে বেশী জমি ঘনীভূত হয়েছে এবং এই মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। ২০০৫ সালের ১.১৭% বড় খামারের গড় আয়তন ছিল ১২.৭৪ একর ১৯৯৬ সালে ছিল ১১.৬০ একর। অন্যদিকে মোট খামারের গড় আয়তন ১৯৯৬ সালের ১.৬৯ একর থেকে কমে ১.৪৮ একর হয়েছে ২০০৫ সালে।

৪। ভাগ চাষ ব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোতে ভাগ চাষ প্রথা চালু রয়েছে। প্রায় ২০% জমি ভাগ চাষের আওতায় রয়েছে যাদের উৎপাদনশীলতা খুবই কম। সাধারণতঃ ভাগ চাষের বন্টন ব্যবস্থায় চিরাচরিত নিয়ম হল ৫০ ঃ ৫০। তবে সেচ সার বীজ প্রভৃতি অবলম্বনকৃত জমিতে ভূমিঃ উপাদানঃ চাষী ১ ঃ ১ ঃ ১ পদ্ধতিতে ভাগ হয়ে যায়।

৫। কৃষির উপখাত ঃ বাংলাদেশের কৃষিখাত চারটি উপখাত নিয়ে গঠিত। যথা- (ক) শস্য উপখাত, (খ) বনজ সম্পদ উপখাত, (গ) পশুসম্পদ উপখাত, (ঘ) মৎস সম্পদ উপখাত।

৬। চাষ পদ্ধতি ঃ বাংলাদেশের কৃষি চাষ পদ্ধতি এখনও সনাতনী রয়েছে। পাওয়ার টিলারের ব্যবহার শুরু হলেও অধিকাংশ জমি চাষ হয় কাঠের লাঙ্গল এবং বলদ দ্বারা। আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হলেও এখনও উন্নত বীজ, সার ইত্যাদির ব্যবহার কম।

৭। উপকরণ নিয়োগ প্রান্তিক উৎপাদনভিত্তিক নয় ঃ বাংলাদেশের কৃষিতে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন- শ্রমিক, জমি, মূলধন ইত্যাদি নিয়োগ করা হয় না। পরিবারের সদস্যরা কাজ ভাগ করে এবং পারিবারিক জমিই চাষ করে।

৮। উদ্বৃত্ত ব্যবহার ঃ বাংলাদেশের কৃষকেরা তাদের মোট উৎপাদনের ৩০% বাজারে বিক্রি করে। বাকী ৭০% নিজেরা ভোগ করে। এর মধ্যে বড় কৃষকেরা বেশি বিক্রি করে এবং ক্ষুদ্র কৃষকেরা কম বিক্রয় করে। অন্যদিকে উদ্বৃত্ত বিক্রি করে বড় কৃষক প্রায় ৮৫%-ই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করে এবং ১৫% উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করে। আর ক্ষুদ্র কৃষক ৪০% অনুৎপাদনশীল খাতে এবং ৬০%-ই উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করে।

৯। কৃষি মজুরি কাঠামো ঃ কৃষি কাঠামোর মধ্যে শ্রমিকের মজুরী প্রদান পদ্ধতি একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বাংলাদেশের কৃষি শ্রমিকেরা অনেক স্থানে খাওয়া + চাল + টাকা, খাওয়া + টাকা অথবা শুধু টাকায় কাজ করে। শ্রমিক নিয়োগ পদ্ধতিতে দৈনিক এবং বছর মেয়াদী ব্যবস্থা রয়েছে। মজুরি নির্ভর করে ঋতুর উপর, ফসল বপন ও কাটার সময় মজুরি বেশি থাকে এবং অন্যান্য সময়ে মজুরি কম থাকে।

বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকা শক্তি। কৃষিখাতের উন্নয়নের উপর কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র বিমোচন, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাই বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে পর্যালোচনা করা হল ঃ

১। স্বল্প উৎপাদনক্ষমতা ঃ বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ; জমি উর্বর এবং উৎকৃষ্ট। কিন্তু তবুও একর প্রতি জমির উৎপাদন খুবই কম। আমাদের দেশে এখনও আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত চাষাবাদ পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার ঘটেনি। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা, উন্নত বীজ, আধুনিক সার ও পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থার অভাবে আমাদের দেশে কৃষিতে উৎপাদনের পরিমাণ কম। উন্নত দেশে যেখানে প্রতি একর জমিতে ২ টনের বেশি ধান উৎপাদিত হয় সেখানে বাংলাদেশে প্রতি একরে ২৪ মন ধান উৎপাদিত হয়। পাটের ক্ষেত্রে একই অবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশে কৃষি শ্রমিকদের বার্ষিক উৎপাদনশীলতা ৳ ২৭৬। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু উৎপাদনশীলতা ৳ ৩৯০০১, নরওয়েতে ৳ ৩২০০০, ভারতে ৳ ৪০৬, ইরানে ৳ ৪০৮৯, পাকিস্ড়নে ৳ ৬২৬। একই সাথে জমির পরিমাণের সাথে উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক ধনাত্মক।

২। প্রাচীন চাষ পদ্ধতি ঃ যান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও বাংলাদেশে এখনও পুরনো আমলের কাঠের লাঙ্গল এবং জীর্নশীর্ণ গরু দ্বারা চাষাবাদ করা হয়। উন্নত ধরণের কৃষি-যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার আমাদের কৃষিতে এখনও ব্যাপক প্রসার লাভ করেনি। চাষের জমিতে পানি সরবরাহের জন্য এখনও অধিকাংশ কৃষক প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। মাত্র ৪৭ ভাগ জমিতে সেচ এবং ৫০ ভাগ জমিতে সার প্রয়োগ করা হচ্ছে। আর্থিক সমস্যা, জ্বালানী খরচ এবং যন্ত্রপাতির মেরামত সংক্রান্ড় অসুবিধার কারণে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে না। সমবায় ব্যবস্থা ও কৃষি ঋণ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রসার লাভ করছেনা। তবে ১৯৯০ সালের পর থেকে পাওয়ার টিলার ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩। কৃষকদের নিম্ন উৎপাদন ক্ষমতা ঃ বাংলাদেশের ৫০ শতাংশেরও অধিক কৃষক পরিবার কার্যত ভূমিহীন। তারা হয় দিন মজুর নয় বর্গা চাষী হিসেবে কাজ করে। কৃষির উপর বর্ধিত জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপে ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এই সমস্ড় ভূমিহীন কৃষকেরা স্বভাবিকভাবেই কৃষিকাজে তেমন উৎসাহবোধ করে না।

৪। অনাবাদী জমি ঃ আমাদের দেশে যে পরিমাণ চাষযোগ্য জমি আছে তার সবটাতে এখনও চাষাবাদ হয় না। এছাড়া উপযুক্ত সেচ ও পানি নিষ্কাশনের অভাবে বাংলাদেশে এখনও বহু জমি চাষের অযোগ্য রয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পানি সেচ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে এ সমস্ড় জমি সহজেই চাষের অধীনে আনা যায়। চাষের অনুপযুক্ত জমির পরিমাণ হল প্রায় ৬৭ লক্ষ একর এবং চাষযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ হল প্রায় ২১ লক্ষ একর। অতএব, দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের মত জনবহুল দেশে জমির অপচয়ের মাত্রাও কম নয়।

৫। জীবনধারণের জন্য চাষ ঃ বিশ্বের উন্নত দেশের কৃষিকাজ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষিকাজ জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কৃষিকাজ খুবই কম হয়। পশুপাখি পালন, মাছের চাষ প্রভৃতি জীবিকা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

৬। উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ ঃ বাংলাদেশের কৃষিতে উৎপাদিত দ্রব্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। (ক) খাদ্য শস্য এবং (খ) অর্থকরী ফসল। খাদ্য শস্য হল গম, ধান, বার্লি, ডাল, মসল্লা, পান, সুপারী ও বিভিন্ন ফল। কৃষির অর্থকরী ফসল হল পাট, চা, তুলা ও ইক্ষু ইত্যাদি। ধান হল প্রধান ফসল। এদেশের ৭৮% জমিতে ধান চাষ করা হয়, ৬% জমিতে পাট, ২% জমিতে ইক্ষু এবং বাকী ১৪% জমিতে অন্যান্য ফসল উৎপাদিত হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে গমের চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭। দূর্যোগ কবলিত কৃষি ঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগের শিকারে বাংলাদেশের কৃষির উৎপাদন অনেক সময় অত্যন্ত কম হয়। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগ তো আছেই। তাছাড়াও আছে কীটপতঙ্গের আকমণ। এ সকল কারণে প্রতি বছর অনেক ফসল নষ্ট হয়।

৮। অদক্ষ কৃষি শ্রমিক ঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক অদক্ষ ও অশিক্ষিত। কৃষি উৎপাদনক্ষেত্রে তাদের তেমন প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান নেই। কারণ বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষা ও কৃষি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা অত্যন্ড় কম।

৯। কৃষির উপর নির্ভরশীলতা ঃ প্রায় ৭০% মানুষ কৃষির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। সরাসরি কৃষিখাতে ৪৮% লোক নিয়োজিত রয়েছে।

১০। জোতের আয়তন ঃ বাংলাদেশের কৃষি জোতগুলো অর্থনৈতিকভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধরণের। ০.৫ একর এর চেয়ে কম মালিকানা আছে এরূপ কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৫০ ভাগ। ১০ ভাগ জমি বিচ্ছিন্ন নয়, বাকী সবই বিচ্ছিন্ন তথা খন্ডে খন্ডে বিভক্ত। ৭.৫ একর এর বেশী জমির জোত ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। (১.৯৮%) ফলে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিকাজ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে।

১১। ছদ্মবেশী বেকারত্ব ঃ বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে এবং কৃষি ছাড়া অন্য খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে কৃষিতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী শ্রমিকের সমাবেশ ঘটে। এই সমস্ড় অপ্রয়োজনীয় জনগণকে আপাত দৃষ্টিতে কর্মে নিয়োজিত মনে হলেও তারা কার্যত বেকার। বাংলাদেশের কৃষিতে এরূপ ছদ্মবেশী বেকারত্বের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ এবং এ কারণে আমাদের কৃষকদের মাথাপিছু আয় কম।

১২। অর্ধবেকারত্ব ঃ কৃষিতে ব্যস্ত মৌসুম এবং মন্দা মৌসুম রয়েছে। ব্যস্ত মৌসুমে কাজের অভাব না থাকলেও মন্দা মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে শ্রমিক বেকার থাকে। কৃষি কাজের সম্পূরক কাজের অভাবে শ্রমশক্তির বিরাট অংশের শ্রম দিন অপচয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামান্য পরিমাণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষকদেরকে কার্যহীন করে এবং দূর্ভিক্ষের মুখোমুখি করে তোলে।

১৩। কৃষিপণ্যের নিম্মান ঃ আমাদের কৃষিপণ্যের মান উন্নত নয়। এ কারণে বিদেশের বাজারে আমাদের কৃষিজাত পণ্য সুনাম অর্জন করতে পারছে না।

১৪। দরিদ্র ও স্বাস্থ্যহীন কৃষক ঃ আমাদের দেশের কৃষকেরা অত্যন্ত গরীব, উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের অভাবে তারা হীনবল ও স্বাস্থ্যহীন। কৃষকের দারিদ্রতা এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির অভাব আমাদের কৃষি উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্ড়রায়।

১৫। শ্রম নিবিড় প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ বাংলাদেশে শ্রম খুবই সস্তা, ফলে আমাদের কৃষিতে শ্রম নিবিড় (Labour intensive) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। কৃষি জোতের আয়তনের কারনেও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার এদেশে খুবই সামান্য।

বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা ঃ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়া স্বত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষি অনগ্রসর এবং জমির একর প্রতি উৎপাদন অত্যন্ত কম। যেখানে জাপানে একর প্রতি জমিতে ৫৮ মন, ইটালিতে ৫২ মন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪৭ মন ধান উৎপাদিত হয়। সেখানে বাংলাদেশে প্রতি একর জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ হল মাত্র ২৪ মন। ২০১০ সালের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আমাদের শতকরা প্রায় ৪৯ ভাগ লোক কৃষি কাজে নিয়োজিত থাকলেও প্রতি বছর বাংলাদেশকে খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। বাংলাদেশের কৃষির সমস্যার কারণসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১। সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদ ঃ গত ৩৮ বৎসরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিগুনেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু কৃষির উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন তেমন হয়নি। কৃষিতে আজও লাঙ্গল, বলদ, কোদাল এবং কাস্ড়ে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলা-কৌশল সম্পর্কে এখনও অধিকাংশ কৃষক অজ্ঞ। তদুপরি আমাদের দেশের গরিব কৃষকদের পক্ষে এসব ব্যয়বহুল কৃষি-যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা কঠিন। ফলে নিবিড়ভাবে জমি চাষ করা সম্ভব হয় না এবং উৎপাদন আশানুরূপ হয় না।

২। সেচ ব্যবস্থার অভাব ঃ বাংলাদেশের কৃষিতে উন্নত সেচ-ব্যবস্থা খুবই সীমিত। দেশের কোন কোন জায়গায় সেচ-ব্যবস্থার প্রচলন পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও বাংলাদেশে এখনও ব্যাপক আকারে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থার

প্রচলন হয়নি। ফলে আমাদের কৃষি এখনও বৃষ্টিপাতের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। অনাবৃষ্টির সময় আমাদের কৃষিক্ষেত্রে পানি সরবরাহ একটি রীতিমত সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, সেচকৃত জমিতে কৃষকদের আয় ১.৫ থেকে ২ গুণ বেশী। অর্থাৎ সেচ ব্যবস্থা প্রয়োগে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করে।

৩। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা ঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগ তথা প্লাবন সৃষ্টিকারী বর্ষাকাল, বৃষ্টিহীন শীতকাল, গ্রীষ্মের কালবৈশাখীতে শিলাবৃষ্টি এবং ঘূর্ণিঝড়ের সমারোহ এবং অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির ফলে শস্য উৎপাদন কোন কোন বছর দারুণভাবে ব্যাহত হয়। ১৯৬০, ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৮৮ সালের প্রবল বন্যা, ৯১ এর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ৯৮ এর দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, ২০০৭ সালের সিডরের তান্ডব আমাদের কৃষি উৎপাদনের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলেছে। এর ফলশ্রুতিতে জাতি প্রায়ই দারুণ হতাশাগ্রস্থ হয়।

৪। জমির খন্ডিকরণ ও বিচ্ছিন্নতা ঃ উত্তরাধিকারী আইন ও কৃষি জমির উপর বর্ধিত জনসংখ্যার চাপের ফলে বাংলাদেশে কৃষি জমির আকার দিন দিন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। আবার অন্যদিকে কৃষকদের সকল জমি সাধারণত এক স্থানে বা এক প্লটে না থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। জমি একত্রীকরণেরও কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেই। ফলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যায় না। তাছাড়া জমির অত্যাধিক উপবিভাগ ও বিচ্ছিন্নতার ফলে সীমানা নির্ধারণের জন্য অনাবাদী জমির অপচয়ের পরিমাণও ব্যাপক।

৫। জল নিষ্কাশনের অভাব ও লবণাক্ততা ঃ নদী-নালা, খাল-বিলের দেশ বাংলাদেশ। এখানে বিরাট হাওর এলাকাগুলোতে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। অন্যদিকে আবার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় সমুদ্রের লবণাক্ত পানি জমিতে ঢুকে পড়ে। এতে ভূমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে অনেক জমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

৬। ভূমি-ক্ষয় ও জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস ঃ বায়ু প্রবাহ, নদী স্রোত, তরঙ্গঘাত, অরণ্যোচ্ছেদ, যন্ত্রবিহীন চাষাবাদ প্রভৃতি কারণে প্রতি বছর আমাদের মৃত্তিকার ক্ষয় হচ্ছে। আবার ফসলচক্র সম্পর্কে কৃষকের ধারণা না থাকায় তারা একই জমিতে বার বার একই ফল চাষ করার ফলে উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে পদ্মা নদীর অববাহিকা এলাকা প্রচন্ড খরার সম্মুখীন হচ্ছে ও উৎপাদন শক্তি কমছে।

৭। উন্নতবীজ ও উপযুক্ত সারের অভাব ঃ বেশী ফলনের জন্য উন্নতমানের বীজ জমিতে বপন করা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য অতি নিম্নমানের বীজ ব্যবহার করা হয়। বীজ সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় বীজের উৎকর্ষতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে উৎপাদন কম হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থায় উপযুক্ত সার প্রয়োগ হয় না। বাংলাদেশে রাসায়নিক সারের সরবরাহ খুবই কম। তাছাড়া রাসায়নিক সারের দামও বেশী এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে অধিকাংশ কৃষকদের জ্ঞানও নেই। দরিদ্র কৃষকেরা গোবর সার ও অন্যান্য দেশীয় সারের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বজায় রাখার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। কিন্তু গোবরকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করায় এখন আর তাও পাওয়া হচ্ছে না। জমিতে উপযুক্ত সার প্রয়োগ করা না হলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায় এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পায় না।

৮। মূলধনের অভাব ও কৃষি ঋণের স্বল্পতা ঃ অধিকাংশ কৃষক দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকায় অর্থাভাবে উন্নতমানের বীজ, রাসায়নিক সার ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে না। ফলে কৃষির উন্নয়নে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন হয় কৃষি ঋণের। কিন্তু যে সব ঋণদান প্রতিষ্ঠান কৃষি ঋণ প্রদান করে তাদের ঋণ প্রদান ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত এবং ঋণদান পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। বাংলাদেশের কৃষি ঋণের উৎস দুটি। যথা- অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎস। বিভিন্ন গবেষণা থেকে লক্ষণীয় যে আমাদের কৃষি ঋণের অতি স্বল্প অংশ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ থেকে আসে। অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুদের হার এত উচ্চ যে, কোন কোন সময় এক মণ ধানের সুদ হিসাবে এক মণ ধান পর্যন্ড় দিতে হয়। সম্প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ উলে- খযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু গ্রাম্য টাউট ও বিশেষ শ্রেণীর ব্যাংক কর্মচারীদের প্রভাবে কৃষকেরা বিভিন্নভাবে হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে কৃষি উন্নয়নও ব্যাহত হচ্ছে।

৯। অশিক্ষা ও কুসংস্কারচ্ছন্নতা ঃ বাংলাদেশের কৃষকেরা অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে উদাসীন থাকে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট নয়।

১০। কৃষি বাজারের ত্রুটি ও প্রেরণমূলক দামের অনুপস্থিতি ঃ বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থার অনুন্নতির জন্য এবং কৃষকদের অবস্থান ক্ষমতা কম হওয়ায় দালাল, ফড়িয়া, মজুতদার ও আড়তদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীরা তাদেরকে ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত করে। তাছাড়া কোন বছরে কোন একটি কৃষি পণ্যের উৎপাদন বাড়লে তার দাম ক্রমশ হ্রাস পায়। ফলে কৃষকেরা উৎপাদিত ফসল হতে প্রেরণামূলক দাম পায় না, এতে উৎপাদন হ্রাস পায়।

১১। কীট-পতঙ্গের আক্রমণ, ফসল মোড়ক ও বিধ্বংসী প্রাণীর প্রভাব ঃ কীট-পতঙ্গের আক্রমণ ও ফসল মোড়কের ফলে বাংলাদেশে প্রতি বছর ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তাছাড়া ইঁদুর, শুকর ও বণ্যপ্রাণী ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে। এ কারণে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি বছর প্রায় শতকরা ১০ ভাগ। কীট-পতঙ্গনাশক ঔষধ পত্রের স্বল্পতা, বেশী দাম ও এর ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদের অজ্ঞতা এ ক্ষয়ক্ষতির মূল কারণ।

১২। সমবায়ের চেতনার অভাব ঃ বাংলাদেশের কৃষিতে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে সমবায়ের চেতনার অভাব। এদের মধ্যে সমবায়ের মনোভাব গড়ে তোলার কার্যকরী উদ্যোগের অভাব দেখা যায়।

১৩। মৌ ভিত্তিক ঃ কৃষি কার্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৩ মাস থেকে ৯ মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। একটি নির্দিষ্ট সময় বা ঋতুতে শস্য উৎপাদন হয় ফলে অন্য সময় কৃষকেরা এক প্রকার কর্মহীন অবস্থায় থাকে। পৃথিবীর খুব কম দেশে বাংলাদেশের মত এরূপ ঋতু ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা দেখা যায়। এর ফলে কৃষির উৎপাদন কম হয়।

১৪। ফসল সংগ্রহ পদ্ধতি ও উন্নত যন্ত্রপাতির অভাব ঃ আমাদের উৎপাদন পদ্ধতি আজও সনাতনী পদ্ধতিতে চলছে। F. A. O. এর হিসেব মতে অনুন্নত দেশগুলোর শস্য সংগ্রহের সময় ২০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়। শস্য সংগ্রহের সময় শ্রমের অপর্যাপ্ততা, দুর্যোগের কারণে পাকা শস্য বন্যায় ডুবে যাওয়া এবং গমের ক্ষেত্রে শুষ্ক আবহাওয়ার সময় শস্য মাড়াই করতে না পারা (আর্দ্র আবহাওয়ায় গম মাড়াই করা যায় না) প্রভৃতি কারণে ফসলের একটি বিরাট অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

বাংলাদেশের কৃষি সমস্যার সমাধান ঃ

১। আধুনিক চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন ঃ বাংলাদেশের কৃষির উন্নতির জন্য সনাতন বা প্রাচীন চাষ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজন। কৃষিখাতের নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পর্যায়ক্রমে কৃষিব্যবস্থা যান্ত্রিকীকরণ এবং আধুনিকীকরণ একান্ড় প্রয়োজন। এতে কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

২। জমির উপরিভাগ ও বিচ্ছিন্নতার কুফল দূরীকরণ ঃ বাংলাদেশের জমির অত্যধিক উপরিভাগ ও বিচ্ছিন্নতার ফলে কৃষিকার্য অলাভজনক হয়ে পড়ছে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। এর কুফল দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত আইনের সাহায্যে জমি একত্রীকরণের ব্যবস্থা করা এবং সমবায় চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

৩। সেচ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ঃ বাংলাদেশের কৃষির উন্নতির জন্য পানিসেচের সুযোগ সুবিধা ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে হবে। এর ফলে অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীলতা থাকবে না, জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে এবং ব্যাপকভাবে উচ্চফলনশীল শস্য উৎপাদন সম্ভব হবে। নলকূপ ও শক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে পানি সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

৪। পানি নিষ্কাশন ঃ নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও বৃহত্তর সিলেট জেলার হাওড় এলাকাগুলোতে যথাযথভাবে পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে ঐসব এলাকায় বোরো ফসল উৎপাদন ও মৎস্য চাষ করা যায়।

৫। রাসায়নিক সারের যথাযথ ব্যবহার ঃ কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন জাতের শস্যের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ রাসায়নিক সারের ব্যবহার করা প্রয়োজন। কৃষকেরা যাতে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক সার স্বল্পমূল্যে পেতে পারে এবং সারের ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৬। উন্নতমানের বীজ বপন ঃ কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নতমানের বীজ বপন করা প্রয়োজন। সেজন্য উত্তম বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষকেরা যাতে স্বল্প মূল্যে এর সরবরাহ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। কীটনাশক ঔষধপত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি করা ঃ ফসল মড়ক, কীট-পতঙ্গ ও ইঁদুর ইত্যাদির আক্রমণ হতে শস্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক ও রোগনাশক ঔষধপত্রের প্রোয়জনমত ব্যবহার করতে হবে। এর জন্য কীটনাশক ও রোগনাশক ঔষধপত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি, স্বল্প মূল্যে তা কৃষকদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৮। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, বাঁধের সাহায্যে প্রধান নদীগুলোর তীর ভাঙ্গা রোধ, বিল ও হাওড় সংস্কার ও খাল খনন, স্লুইস গেইট স্থাপন ইত্যাদির প্রয়োজন। যেহেতু বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর উৎস ভারতে অবস্থিত সে কারণে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ভারত-বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে পরস্পরের স্বার্থ সংরক্ষণ করে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হওয়া উচিত।

৯। লবণাক্ততা দূরীকরণ ঃ সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হতে সামুদ্রিক উপকূলাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ একর জমির ফসল রক্ষার জন্য সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করা প্রয়োজন।

১০। পর্যাপ্ত কৃষি ঋণের ব্যবস্থা ঃ যেহেতু বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক ভূমিহীন-প্রান্তিক ও দরিদ্র সে কারণে সহজ শর্তে এ কৃষকদের পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করতে হবে। এ জন্যে কৃষি ঋণ প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঋণ প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি, গ্রাম এলাকায় এ সব প্রতিষ্ঠানের অধিক সংখ্যক শাখা প্রতিষ্ঠা, কম সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, ঋণ প্রদানে দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতির মূলোৎপাটন, অকৃষি খাতে কৃষি ঋণের প্রবাহ রোধ ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি ঋণের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

১১। ভূমি সংস্কার ঃ বাংলাদেশের কৃষিতে যে উৎপাদন সম্পর্ক বিদ্যমান তা নিঃসন্দেহে শোষণের সম্পর্ক। এ শোষণের অবসানের জন্য বর্তমান ভূমিস্বত্ত্ব ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত চাষীরা যাতে জমির মালিক হতে পারে,

বর্গা চাষীরা ফসলের ন্যায্য অংশ যাতে পায়, কৃষি শ্রমিকেরা যেন ন্যায্য মজুরি পায় এবং ভূমিহীন কৃষকেরা যাতে ভূমি পায় ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করতে হবে।

১২। সমবায় খামার প্রবর্তন এবং কৃষি বাজারের উন্নতি সাধন ঃ বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকায় সমবায় খামার প্রবর্তন করলে জমির উপরিভাগ ও বিচ্ছিন্নতার কুফল দূর হবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হবে, চাষের জমির অপচয় হ্রাস পাবে, কৃষি ঋণ সহজলভ্য হবে এবং কৃষি বাজারের অধিকাংশ ত্রুটি দূর করা সম্ভব হবে। কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ইউনিয়ন বা গ্রাম পর্যায়ে সমবায় বাজার সমিতি গঠণ করা। সমবায় বাজার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে ফড়িয়া ও দালালদের দৌরাত্ম হ্রাস পাবে এবং কৃষকেরা ন্যায্য মূল্যে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারবে।

১৩। বিভিন্ন সাহায্যকারী আয়ের সৃষ্টি ঃ বাংলাদেশের কৃষিতে মৌসুমী বেকারত্ব বিদ্যমান। ফলে সারা বছর কৃষকদের কাজ থাকে না। তাই কৃষকদের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার অকৃষি কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

১৪। শস্য বহুমুখীকরণ ঃ বাংলাদেশের কৃষকেরা শুধুমাত্র ধান, গম ও পাট উৎপাদনে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু কৃষি উন্নতির জন্য এগুলো সহ আরও বহু ধরণের শস্য উৎপাদন করতে হবে।

১৫। আধুনিক উপকরণ সরবরাহ ঃ বাংলাদেশের কৃষকেরা গরিব তাই তারা উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি ক্রয় করে ব্যবহার করতে পারে না। তাই ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের এ সকল আধুনিক উপকরণ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে বাংলাদেশের কৃষি উন্নত হবে এবং কৃষকদের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে।

১৬। গুদামজাতকরণের সুবিধা ঃ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষিপণ্য গুদামজাতকরণের সুবিধা নেই। গুদামের অভাবে কৃষক কৃষি পণ্য সংরক্ষণ করতে পারে না বলে সে ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় না। সুতরাং খামারের নিকটবর্তী স্থানে গুদামজাতকরণের সুবিধা থাকা প্রয়োজন।

১৭। বাণিজ্যিক খামার ব্যবস্থা ঃ আমাদের দেশে এখনও জীবনধারণোপযোগী খামার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এ ধরণের খামারে কৃষক তার নিজস্ব শ্রম ও সনাতন কৃষি যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষাবাদে আগ্রহী। কারণ এতে ঝুঁকি কম। এমতাবস্থায় আধুনিক চাষ পদ্ধতির সকল উপকরণের ন্যায্যমূল্য ও সময়মসত সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। এতে দেশে বাণিজ্যিক খামার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে ও কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

১৮। কৃষিপণ্যের মূল্য সংরক্ষণ ঃ কৃষি পণ্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক বিধায় উৎপাদন বাড়লে দাম হ্রাস পায় ও কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয় । তাই পৃথিবীর সকল দেশেই কৃষিপণ্যের মূল্য সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করা হয়। আমাদের দেশেও সরকার কর্তৃক মূল্য সংরক্ষণনীতি (Price Support Policy) গ্রহণ করা উচিত।

১৯। উৎপাদন বিশেষায়ন ঃ এক একটি এলাকা এক একটি শস্য উৎপাদনে বিশেষভাবে দক্ষ। এই দক্ষতার ভিত্তিতে ও ফসলের জন্য উপযোগীতা নির্ধারণ করে শস্য উৎপাদনের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। সম্প্রতি সবজি আমাদের রপ্তানী আইটেমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। তাই আঞ্চলিকভাবে যদি কৃষি পণ্যের রপ্তানি এলাকা করা যায় তাহলে কৃষি উন্নত হবে।

২০। হাঁস-মুরগী ও পশু পালন ঃ দেশের জনগণের শক্তি ও খাদ্যের উৎস হিসাবে অনেক পশু-পাখি ব্যবহৃত হয়। অথচ এই পশু-পাখি সমূহ অকাল মৃত্যুর মাধ্যমে কৃষককে সর্বশান্ত করে দেয়। কাজেই হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশুর রোগ থেকে রক্ষার জন্যে পর্যাপ্ত পশু চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। অধিকহারে হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশুর খামার স্থাপন করতে হবে। পশুখাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য শস্য উৎপাদনের সাথে সুষমহারে পশুর খাদ্য যোগান দেয়া আবশ্যক।

২১। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ঃ দেশের প্রতিটি এলাকায় মাছের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে মৎস্য চাষ বাড়ানো দরকার। যে সমস্ত পুকুর, নদী নালায় মাছ উৎপাদন সম্ভব সেখানে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উন্নত চিংড়ি চাষের প্রযুক্তি সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। যা আমাদের রপ্তানী আয় কয়েকগুণ বাড়াতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১১.১

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশের কৃষি উপখাতগুলো কি?
২. ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলতে কি বুঝায়?
৩. জমির খণ্ডিকরণ ও বিচ্ছিন্নতার কারণ কি?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো বিশ্লেষণ করুন।
২. বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

৩. বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা উল্লেখ করুন।
৪. বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ-২: বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও কৃষির আধুনিকীকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনের গতিধারা বিশ্লেষন করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল উৎপাদনের গতিধারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কৃষির আধুনিকীকরণ এবং বাংলাদেশের কৃষিতে এর প্রয়োজনীয়তা সনাক্ত করতে পারবেন।

বাংলাদেশে নানা প্রকারের কৃষিজাত পণ্য উৎপন্ন হয়। এদের মোট দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- খাদ্য শস্য ও অর্থকরী ফসল।

খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসলের মধ্যে পার্থক্য ঃ

ক) খাদ্য শস্য (Food Crops) ঃ খাদ্যশস্য বলতে সে সব কৃষিজাত পণ্যকে বুঝায় যা মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত দেশের অভ্যন্ড়রীন চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে এসব শস্য ব্যবহৃত হয়। তবে দেশের জনগণের চাহিদা মেটানোর পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে বিদেশে তা রপ্তানি করা হয়। যেমন- ধান, গম, যব, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রদান খাদ্য শস্য।

খ) অর্থকরী ফসল (Cash Crops) ঃ অর্থকরী শস্য বা ফসল বলতে সেসব শস্য বা ফসলকে বুঝায় যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপন্ন করা হয়। সাধারণত উৎপাদনকারিগণ এসব শস্য দেশীয় বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে এবং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের জন্য বিদেশেও এসব শস্য রপ্তানী করা হয়। যেমন- পাট, তুলা, তামাক, চা ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রধান অর্থকলি ফসল।

তবে ব্যবহারের তারতম্য অনুযায়ী কতকগুলো শস্যকে খাদ্যশস্যে অথবা অর্থকরী ফসল উভয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়। যেমন- চা, ইক্ষু, নারিকেল, সরিষা ইত্যাদি। তেমনি কোন একটি নির্দিষ্ট শস্য কোন একটি দেশের জন্য খাদ্যশস্য হিসাবে, আবার কোন দেশের জন্য অর্থকরী ফসল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কোন শস্য যখন কোন দেশের মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটায় তখন তাকে খাদ্য শস্য এবং কোন দ্রব্য যখন যখন মুনাফা অর্জনের জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করা হয় তখন তাকে অর্থকরী শস্য বলা হয়।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের গতিধারা ঃ

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খাদ্য শস্য উৎপাদনের গতিধারা ঃ

১। ধান ঃ বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য শস্য হল ধান। দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। তাই বাংলাদেশের মোট আবাদী জমির শতকরা প্রায় ৭৮ শতাংশে ধান উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের সর্বত্র ধান চাষ হলেও দিনাজপুর, নওগাঁ, কুষ্টিয়া, রংপুর, বরিশাল প্রভৃতি এলাকায় বেশী ধান জন্মে। বাংলাদেশে মূলত চার প্রকার ধান জন্মে। যথা- আউশ, আমন, বোরো এবং ইরি ধান। নিম্নে সারণীতে ধান উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ ও একর প্রতি ফলন দেখানো হল ঃ

সারণী- ১ ঃ ধান চাষাধীন আবাদী জমির পরিমাণ, উৎপাদন ও একর প্রতি ফলন

বছর	জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ	একর প্রতি ফলন
২০০৪-২০০৫	২৫৬.২১ লক্ষ একর	২৫১.৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন	৯৭৯ কিলোগ্রাম
২০০৫-২০০৬	২৬০.১৯ লক্ষ একর	২৬৫.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন	১০১৯ কিলোগ্রাম
২০০৬-২০০৭	২৬১.১৬ লক্ষ একর	২৭৩.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন	১০৪৬ কিলোগ্রাম
২০০৭-২০০৮	২৬১.২৯ লক্ষ একর	২৮৯.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন	১১০৭ কিলোগ্রাম
২০০৮-২০০৯	২৭৮.৭২ লক্ষ একর	৩১৩.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন	১১২৩ কিলোগ্রাম

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ঃ ২০১০

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৪-২০০৫ সালের পর থেকে ধানের মোট উৎপাদন ও একর প্রতি ফলন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধান চাষে ক্রমান্বয়ে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারই এর অন্যতম কারণ। বর্তমানে দেশে

* ১৮৪ পৃষ্ঠায় পরিশিষ্ঠ ০১ এ দেখুন।

উচ্চফলনশীল জাতের বীজ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধির ফলেও ধানের উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। তবে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

২। গম ঃ বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য হল গম। বর্তমানে এদেশে আটা ও ময়দার ভোগ ক্রমশ বাড়ছে এবং গমের চাষও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। প্রধানত দিনাজপুর, পাবনা, রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলে বেশী গম চাষ হচ্ছে। নিম্নের সারণীতে এদেশের গম উৎপাদনের গতিধারা দেখানো হল ঃ

সারণী- ২ ঃ গম চাষাধীন আবাদী জমির পরিমাণ, উৎপাদন ও একর প্রতি ফলন

বছর	জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ	একর প্রতি ফলন
২০০৪-২০০৫	১৩.৮০ লক্ষ একর	৯.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন	৭০৭ কিলোগ্রাম
২০০৫-২০০৬	১৯.৮৩ লক্ষ একর	৭.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন	৬২১ কিলোগ্রাম
২০০৬-২০০৭	৯.৮৮ লক্ষ একর	৭.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন	৭৪৫ কিলোগ্রাম
২০০৭-২০০৮	৯.৫৮ লক্ষ একর	৮.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন	৮৮১ কিলোগ্রাম
২০০৮-২০০৯	৯.৭৫ লক্ষ একর	৮.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন	৮৭০ কিলোগ্রাম

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ঃ ২০১০

উপরের ছকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৪-২০০৫ সাল থেকে গম চাষাধীন জমির পরিমাণ হ্রাস পেলেও মোট উৎপাদনের পরিমাণ মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে গম উৎপাদনে একর প্রতি ফলন ও বৃদ্ধি পেয়েছে। উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ, রাসায়নিক সারের ব্যবহারের ফলে কম জমিতে অধিক পরিমাণে গম উৎপাদন হচ্ছে। তবে গম উৎপাদনেও বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

৩। তৈল বীজ ঃ বাংলাদেশে সরিষা, তিল, তিষি, বাদাম, নারিকেল প্রভৃতি তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। নিম্নের সারণী থেকে তৈলবীজ উৎপাদনের গতিধারা বুঝা যায় ঃ

সারণী- ৩ ঃ তৈলবীজের আওতায় জমির পরিমাণ, উৎপাদন ও একর প্রতি ফলন

বছর	জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ	একর প্রতি ফলন
২০০৪-২০০৫	৮.২৮ লক্ষ একর	৩.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন	৩৬৭ কিলোগ্রাম
২০০৫-২০০৬	৭.৮৪ লক্ষ একর	৩.২২ লক্ষ মেট্রিক টন	৪১০ কিলোগ্রাম
২০০৬-২০০৭	৭.৮৯ লক্ষ একর	৩.২২ লক্ষ মেট্রিক টন	৪০৮ কিলোগ্রাম
২০০৭-২০০৮	৮.৩৪ লক্ষ একর	৩.৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন	৪২৯ কিলোগ্রাম
২০০৮-২০০৯	৮.৩৪ লক্ষ একর	৩.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন	৪০৪ কিলোগ্রাম

উৎস ঃ ক) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ঃ ২০১০, খ) Statistical Year Book- ২০০৯.

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, তৈলবীজ উৎপাদনে চাষাধীন এলাকা ও সেই সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। ডাল ঃ বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরণের ডাল উৎপন্ন হয়। এদের মধ্যে মসুর, মুগ, খেসারি ও মাসকলাই প্রধান। ডাল আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য। নিম্নের সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ডাল চাষাধীন জমির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। তবে ডালের একর প্রতি ফলন মোটামুটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণী- ৪ ঃ ডালের জমির পরিমাণ, উৎপাদন ও একর প্রতি ফলন

বছর	জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ	একর প্রতি ফলন
২০০৪-২০০৫	৯.৪৭ লক্ষ একর	৩.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন	৩৩৩ কিলোগ্রাম
২০০৫-২০০৬	৮.৩৩ লক্ষ একর	২.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন	৩৩৪ কিলোগ্রাম
২০০৬-২০০৭	৭.৬৯ লক্ষ একর	২.৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন	৩৬৪ কিলোগ্রাম
২০০৭-২০০৮	৫.৫৮ লক্ষ একর	২.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন	৩৬৫ কিলোগ্রাম
২০০৮-২০০৯	৫.৫৯ লক্ষ একর	১.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন	৩৫০ কিলোগ্রাম

উৎস ঃ ক) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ঃ ২০১০, খ) Statistical Year Book- ২০০৯.

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল উৎপাদনের গতিধারা ঃ

আমরা জানি যে সকল ফসল সরাসরি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে চাষ করা হয়, তাদের অর্থকরী ফসল বলা হয়। এতে কৃষকদের হাতে মূলত নগদ টাকা আসে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল হল পাট, চা, তুলা, আঁখ, তামাক ইত্যাদি। নিম্নে এদের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হল ঃ

১। পাট ঃ পাট বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পাট উৎপাদনকারী দেশ। বাংলাদেশের যশোর, ঢাকা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চলে পাট বেশী জন্মে। তবে পাটের পূর্বের সেই স্বর্ণযুগ এখন আর নেই। পাটের বিকল্প সিনথেটিক ফাইবার আবিষ্কারের ফলে বিশ্ববাজারে পাট ও পাটযুক্ত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। তদুপরি, ইতোমধ্যে ভারত ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ পাট উৎপাদনে বেশ এগিয়ে গিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রবল প্রতিদ্বন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের পাট উৎপাদনের গতিধারা দেখানো হল ঃ

সারণী- ৫ ঃ পাট চাষাধীন জমির পরিমাণ, উৎপাদন ও একর প্রতি ফলন

বছর	জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ	একর প্রতি ফলন
২০০৪-২০০৫	৯.৬৫ লক্ষ একর	৭.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন	৭৪৩ কিলোগ্রাম
২০০৫-২০০৬	৯.৯৩ লক্ষ একর	৮.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন	৮৪১ কিলোগ্রাম
২০০৬-২০০৭	১০.৩৪ লক্ষ একর	৮.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন	৮৫৪ কিলোগ্রাম
২০০৭-২০০৮	১০.৮৯ লক্ষ একর	৮.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন	৭৬৮ কিলোগ্রাম
২০০৮-২০০৯	১০.৩৯ লক্ষ একর	৮.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন	৮১৫ কিলোগ্রাম

উৎস ঃ ক) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ঃ ২০১০, খ) বি বি এস, বাংলাদেশের কৃষি পরিসংখ্যান

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, পাট চাষাধীন জমির ও উৎপাদনের পরিমাণ মোটামুটি অপরিবর্তিত রয়েছে কিন্তুএকর প্রতি ফলন বিভিন্ন বৎসরে উঠানামা করেছে। মাঝে মধ্যে পাটের জমিতে ধানের চাষও হয়।

২। চা ঃ অর্থকরী ফসল হিসেবে বাংলাদেশে পাটের পরেই চা এর স্থান। পাট ও চা দুটি পণ্যই আমরা রপ্তানি করি। নিম্নে চা চাষে ব্যবহৃত ভূমি ও উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হল ঃ

সারণী- ৬ ঃ চা চাষের আওতায় জমির পরিমাণ, উৎপাদন ও একর প্রতি ফলন

বছর	জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ	একর প্রতি ফলন
২০০২-২০০৩	১.২৫ লক্ষ একর	৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন	৪৫৩ কিলোগ্রাম
২০০৩-২০০৪	১.২৬ লক্ষ একর	৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন	৪৫৬ কিলোগ্রাম
২০০৪-২০০৫	১.৩২ লক্ষ একর	৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন	৪৩৮ কিলোগ্রাম
২০০৫-২০০৬	১.৩০ লক্ষ একর	৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন	৪৪৭ কিলোগ্রাম

উৎস ঃ বি বি এস বাংলাদেশের পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ- ২০০৯

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, চা আবাদে জমির পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদনের পরিমাণ ততটা বাড়েনি। অন্যদিকে একর প্রতি ফলন বিভিন্ন বছরে উঠানামা করেছে। অতএব, দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল থেকে আয় বৃদ্ধির জন্য সরকারের এই ফসলের চাষাবাদ বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

৩। ইক্ষু (ঝঁমধৎপধহব) ঃ ইক্ষু বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশ চিনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়া স্বত্ত্বেও বাংলাদেশে জলবায়ু ও মাটি ইক্ষু চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দেশের দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর ইত্যাদি অঞ্চলে ইক্ষু চাষ বেশী হয়।

সারণী- ৭ ঃ ইক্ষু চাষাধীন জমির পরিমাণ, উৎপাদন ও একর প্রতি ফলন

বছর	জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ	একর প্রতি ফলন
২০০৪-২০০৫	৩.৮৮ লক্ষ একর	৬৪.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন	১৬৫৫৪ কিলোগ্রাম
২০০৫-২০০৬	৩.৭৭ লক্ষ একর	৫৫.১১ লক্ষ মেট্রিক টন	১৪৬১৮ কিলোগ্রাম
২০০৬-২০০৭	৩.৭১ লক্ষ একর	৫৭.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন	১৫৫৫২ কিলোগ্রাম
২০০৭-২০০৮	৩.১২ লক্ষ একর	৪৯.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন	১৫৯৭৪ কিলোগ্রাম
২০০৮-২০০৯	৩.১২ লক্ষ একর	৫২.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন	১৬৭৭২ কিলোগ্রাম

উৎস ঃ বাংলাদেশ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ- ২০০৯।

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ইক্ষু চাষের অধীনে জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং একর প্রতি ফলন বিভিন্ন সময়ে উঠানামা করছে। যেহেতু বাংলাদেশকে প্রতি বছর চিনি আমদানি করতে হয় সেকারণে ইক্ষু চাষ উন্নয়নের প্রতি সরকারের আরও বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

৪। তামাক ঃ তামাক বাংলাদেশের একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশে রংপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও ঢাকা অঞ্চলে প্রচুর তামাক উৎপন্ন হয়। এ সকল তামাক মূলত বিড়ি, সিগারেট, চুরুট এবং জর্দ্দা তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। নিম্নে বাংলাদেশে তামাক চাষের গতিধারা দেখানো হল ঃ

সারণী- ৮ ঃ তামাক চাষাধীন জমির পরিমাণ, উৎপাদন ও একর প্রতি ফলন

বছর	জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ	একর প্রতি ফলন
২০০৪-২০০৫	০.৭৪ লক্ষ একর	০.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন	৫১৩ কিলোগ্রাম
২০০৫-২০০৬	০.৭৮ লক্ষ একর	০.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন	৫৫১ কিলোগ্রাম
২০০৬-২০০৭	০.৭৬ লক্ষ একর	০.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন	৫১৩ কিলোগ্রাম
২০০৭-২০০৮	০.৭২ লক্ষ একর	০.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন	৫৫৫ কিলোগ্রাম
২০০৮-২০০৯	০.৭৪ লক্ষ একর	০.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন	৫৪০ কিলোগ্রাম

উৎস ঃ বি বি এস বাংলাদেশ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ- ২০০৯।

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে তামাক চাষের আওতায় জমির পরিমাণ ও উৎপাদন প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। কিন্তু একর প্রতি ফলন বিভিন্ন বছরে হ্রাস বৃদ্ধি হয়েছে।

৫। অন্যান্য ফসল ঃ বাংলাদেশে উপরোক্ত প্রধান অর্থকরী ফসল ছাড়াও তুলা, রেশম, রাবার, পান-সুপারী ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের চাষাবাদ হচ্ছে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

কৃষির আধুনিকীকরণ বলতে কি বুঝায়?

কৃষির আধুনিকীকরণ বলতে কৃষির সর্বক্ষেত্রে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগকে বুঝায়। সুতরাং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি পর্বের বিভিন্ন পর্যায়ে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, আধুনিক উপকরণ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক জোত গঠণ, ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি সম্পদের উন্নয়ন ও বিজ্ঞান সম্মত ভূমিস্বত্ত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করাকে কৃষির আধুনিকীকরণ বলে। এখানে উল্লেখ্য কৃষির আধুনিকীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ ধারণা দুটি এক নয়, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের তুলনায় কৃষির আধুনিকীকরণের ধারনাটি অধিকতর ব্যাপক।

কৃষির আধুনিকীকরণ কর্মসূচীতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত ঃ উৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধের বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা করা।

তৃতীয়ত ঃ কৃষি কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে আধুনিক উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার।

চতুর্থত ঃ আধুনিক কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা, ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি সম্পদ উন্নয়ন, বিজ্ঞান সম্মত ভূমিস্বত্ত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।

পঞ্চমত ঃ শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার।

ষষ্ঠত ঃ কৃষির চাষযোগ্য জমির স্থায়ী উন্নতি সাধন।

সপ্তমত ঃ কৃষিতে আধুনিক উপকরণ তথা উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার।

বাংলাদেশে কৃষি আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা ঃ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হয়েও বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। সুতরাং উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে অবিলম্বে এদেশে কৃষির ফলন বৃদ্ধি করা দরকার। নিম্নে বাংলাদেশের কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হল ঃ

১। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ঃ উন্নত প্রযুক্তির অভাবে বাংলাদেশের কৃষি একান্তভাবেই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। সময়মত বৃষ্টিপাত না হলে আমাদের কৃষকের জীবনে হাহাকার নেমে আসে। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে কৃষকদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা সম্ভব।

২। শস্য সংরক্ষণ ঃ আধুনিক পদ্ধতিতে শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় বাংলাদেশে প্রতি বছর বহু ফসল নষ্ট হয়। কানাডার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাবে অনুন্নত দেশগুলোর উৎপাদিত শস্যের প্রায় এক চতুর্থাংশ নষ্ট হয়ে যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে শস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এ ধরণের অপচয় রোধ করা সম্ভব।

৩। উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ বাংলাদেশে প্রতি বছর ১৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি থাকে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। যেভাবে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো তাদের কৃষির ফলন বহুগুণ বৃদ্ধি করতে পেরেছে আমরাও ঠিক তেমনি সঠিক প্রযুক্তির সাহায্যে আমাদের কৃষির ফলন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে পারব।

৪। উৎপাদন ব্যয় কম ঃ কাঠের লাঙ্গল ও এক জোড়া বলদের দ্বারা একদিনে ৪″ গভীর করে যেখানে অর্ধ একর জমি চাষ করা যায় সেখানে একটি ট্রাক্টরের দ্বারা ১ ফুট গভীরভাবে ১০০ একর জমি ভালভাবে চাষ করা সম্ভব। সুতরাং কৃষি যান্ত্রিকরণের মাধ্যমে জমি ভালভাবে চাষ করা যায়, অল্প সময়ে বেশী জমি চাষ করা সম্ভব হয়। ফলে একর প্রতি উৎপাদন বাড়ে এবং উৎপাদন ব্যয় কম হয়।

৫। অনাবাদী জমি চাষ ঃ বাংলাদেশের পাহাড়িয়া অঞ্চল এবং হাওড় এলাকার বহু জমি পতিত থাকে। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনার হাওড় এলাকার প্রচুর জমি চাষের অধীনে আনা সম্ভব। অধিকন্তু উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া অঞ্চলের প্রচুর পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব।

৬। নিবিড় চাষ ঃ বাংলাদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে আবাদি জমির পরিমাণ খুবই কম। বর্তমানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.২৫ একর। অথচ দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটাতে হলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু দেশের সম্প্রসারণমূলক চাli (Extensive Cultivation) পরিবর্তে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে নিবিড় চাষের (Intensive Cultivation) ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চ ফলনশীল বীজ ও সার ব্যবহার করে একই জমিতে বছরে তিন চার ধরণের ফসল ফলানো যায়। যেমন- জাপানে এই পদ্ধতি সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে আমাদের দেশেও এই পদ্ধতি প্রবর্তন করে এর সুফল লাভ করা যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১১.২

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
২. বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনের গতিধারা বিশে- ষন করুন।
৩. বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল উৎপাদনের গতিধারা ব্যাখ্যা করুন।
৪. কৃষির আধুনিকীকরণ বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশের কৃষিতে এর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৩: বাংলাদেশের শিল্পখাত ঃ বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে শিল্পখাতের অবস্থান ও শিল্প কাঠামো বিষয়ে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের শিল্পখাতের তিনটি উপখাত, যথা- (ক) বৃহৎ শিল্প, (খ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও (গ) কুটির শিল্পের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন ধরণের শিল্পের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বাংলাদেশের শিল্প খাতের অবস্থান ঃ

বাংলাদেশ শিল্পে অনগ্রসর। আমাদের জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান উন্নত দেশের তুলনায় অনেক কম। দেশে এখনো শিল্পের তুলনায় কৃষিখাতের প্রাধান্য বজায় রয়েছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি ও শিল্পের অবদান ছিলো যথাক্রমে ৬২ শতাংশ ও ৪ শতাংশ। পরবর্তীতে কৃষির অবদান আস্তে আস্তে হ্রাস ও শিল্পের অবদান খুব ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায়। ২০০৯-১০ সনে আমাদের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান ছিল ১৭.৮৭ শতাংশ। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও শিল্পের অবদান খুবই সামান্য। বর্তমানে দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৮.৪ শতাংশ কৃষিতেও মাত্র ২৪.৩ শতাংশ শিল্পখাতে নিয়োজিত রয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোতে বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র ওকুটির শিল্পের ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের শিল্পখাতকে তিনটি উপখাতে বিভক্ত করা যায়। যথা ঃ

১। বৃহৎ শিল্প

২। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

৩। কুটির শিল্প

১। বৃহৎ শিল্প ঃ বাংলাদেশের শিল্প আইন অনুযায়ী যে শিল্প কারখানায় ২৩০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করে তাকে বৃহৎ শিল্প বলে। অন্যদিকে ২০০৫ সনের শিল্পনীতিতে যে সমস্ড় শিল্পের জমি এবং স্থায়ীভবন ব্যতিরেকে অন্যান্য মোট স্থায়ী বিনিয়োগ ১০ কোটি টাকার বেশি তাদেরককে বৃহদায়তন শিল্প বলা হয়েছে। বৃহৎ শিল্প কারখানায় দক্ষ শ্রমিক, প্রচুর মূলধন ও জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিপুল পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয়। পাট, বস্ত্র, চিনি, সিমেন্ট, কাগজ, সার, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের উদাহরণ।

মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের অবদান ঃ

মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব সর্বাধিক। বাংলাদেশে শিল্পখাতে বার্ষিক গড়ে চলতি মূল্যে যে পরিমাণ মূল্য সংযোজিত হয় তার প্রায় ৪৮ শতাংশ বৃহদায়তন শিল্প থেকে পাওয়া যায়। তবে বৃহৎ শিল্পে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ সর্বাধিক হলেও এই উপখাতে কর্মসংস্থানের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। বাংলাদেশের শিল্পখাতের শ্রমশক্তির মাত্র ১৩ শতাংশ বৃহৎ শিল্পে নিয়োজিত।

২। মাঝারি শিল্প ঃ বাংলাদেশের শিল্প আইন অনুযায়ী যে কারখানায় ২০ জনের বেশী কিন্তু ২৩০ জনের কম শ্রমিক নিয়োজিত তাকে মাঝারি শিল্প বলে। ২০০৫ সনের শিল্পনীতিতে যে সমস্ড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি এবং স্থায়ীভবন ব্যতিরেকে অন্যান্য মোট স্থায়ী বিনিয়োগ ১.৫০ কোটি টাকা হতে ১০ কোটি টাকা সেগুলোকে মাঝারি শিল্প বলা হয়েছে। সিরামিক, অটোমোবাইলসসহ হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং, সিল্ক শিল্প, কোল্ড স্টোরেজ, ফার্ণিচার ইত্যাদি মাঝারি শিল্পের অন্তর্গত।

৩। ক্ষুদ্র শিল্প ঃ বাংলাদেশের কারখানা বা শিল্প আইন অনুযায়ী যে কারখানায় সর্বোচ্চ ২০ জন শ্রমিক কাজ করে তাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে। এখানে ভাড়া করা শ্রমিক ও বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে উন্নত প্রযুক্তিও ব্যবহার করা হয়। ২০০৫ সনের শিল্পনীতি অনুযায়ী যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয় অনধিক ১.৫০ কোটি টাকা সেগুলোকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। ছোট ছোট ফ্যাক্টরীতে ক্ষুদ্র শিল্পের কাজ চলে। হোসিয়ারী শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, দোশলাই শিল্প ইত্যাদি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পের উদাহরণ।

মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান ঃ

বাংলাদেশের মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। দেশের শিল্পখাতে বার্ষিক গড়ে চলতি মূল্যে যে পরিমাণ মূল্য সংযোজিত হয় তার প্রায় ৩৫ শতাংশ এই শিল্প থেকে পাওয়া যায়। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও এই উপখাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের শিল্পখাতের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ২৬ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে।

মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের অবদান ঃ

মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে কুটির শিল্পর অবদান সর্বনিম্ন। বাংলাদেশে শিল্পখাতে বার্ষিক গড়ে চলতি মূল্যে যে পরিমাণ মূল্য সংযোজিত হয় তাতে কুটির শিল্পের অবদান মাত্র ১৭ শতাংশ। কিন্তু কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কুটির শিল্প সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে শিল্পখাতের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৬১ শতাংশ কুটির শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে।

বাংলাদেশের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব ঃ

যে কোন দেশের শিল্পখাতে উন্নয়ন মূলত বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভারী শিল্পের উন্নয়ন না ঘটিয়ে দেশে স্বনির্ভর শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করা যায় না। সুতরাং বাংলাদেশে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পাশাপাশি বৃহদায়তন শিল্পের উন্নয়নের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নিম্নোক্ত যুক্তিতেঃ

১। অধিক উৎপাদন ক্ষমতা ঃ বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরণের শিল্পের মধ্যে বৃহদায়তন শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে কম অথচ মূল্য সংযোজনের পরিমাণ সর্বাধিক। সুতরাং বৃহৎ শিল্পে শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা ক্ষুদ্র শিল্পের তুলনায় অধিক। অতএব, বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের দ্রুত প্রসার একান্ত আবশ্যক।

২। উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার ঃ বৃহৎ শিল্পগুলো তাদের উপজাত দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য সহযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। এতে উপজাত দ্রব্যের অপচয় হ্রাস পায় এবং উৎপাদন ব্যয় কমে। বৃহদায়তন শিল্পের আন্ড় শিল্প সংযুক্তি (Linkage) বেশি হলে এবং এ ধরণের শিল্পের প্রসার ঘটলে অন্যান্য সংযুক্ত শিল্পেরও উন্নতি হয়। ফলে দেশে শিল্পোন্নয়নের গতি বাড়ে।

৩। ব্যয় সংকোচের সুবিধা ঃ বৃহদায়তন শিল্প বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারে। ফলে বৃহদায়তন শিল্পে উৎপাদন খরচ কম পড়ে। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ কম বলে গড় উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে।

৪। বিস্তৃত বাজার ঃ বৃহদায়তন শিল্প উন্নতমানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে তৈরী উৎকৃষ্ট দ্রব্য অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রি করতে পারে। ফলে এ সমস্ত শিল্পের বাজার বিস্তৃত হয়।

৫। দ্রব্যমূল্য হ্রাস ঃ উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করার ফলে বৃহদায়তন শিল্পে দ্রব্যের মূল্য ক্ষুদ্র শিল্পের দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা কম হয়। এতে ভোক্তারা উপকৃত হয় ও দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে।

৬। অধিক কাঁচামাল ব্যবহার ঃ বৃহদায়তন শিল্প অধিক পরিমাণে কাঁচামাল ব্যবহার করে। এতে দেশে উৎপাদিত কাঁচামালসমূহের সদ্ব্যবহার হয়।

৭। ঝুঁকি হ্রাস ঃ বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ বেশী বলে ঝুঁকির পরিমাণ কম। ফলে বৃহদায়তন শিল্পের ব্যবসায়িক সাফল্য নিশ্চিত।

৮। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবস্থান ঃ দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক বেশী। ফলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প আমাদের বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অতএব দ্রুত শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব অধিক হলেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার অব্যাহত রাখতে হবে।

বাংলাদেশে কোন ধরণের শিল্পের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত?

১। শ্রম নিবিড় শিল্প ঃ জনবহুল বাংলাদেশে বেকার সমস্যা প্রকট। বাংলাদেশে প্রচুর শ্রমিকের যোগান রয়েছে। অথচ অন্যদিকে মূলধনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অতএব বাংলাদেশে এমন ধরণের শিল্প স্থাপন করা উচিত যে সকল শিল্পে অধিক শ্রমিক এবং স্বল্প মূলধনের প্রয়োজন হয়। শ্রম নিবিড় শিল্প স্থাপিত হলে একদিকে যেমন মূলধন স্বল্পতাজনিত সমস্যার সমাধান হবে তেমনি অন্যদিকে আমাদের বেকার সমস্যাও অনেকাংশে লাঘব হবে।

২। কৃষি ভিত্তিক শিল্প ঃ কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষিজাত কাঁচামালের উপর ভিত্তি করেই শিল্পোন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু করতে হবে। বাংলাদেশ পাট, ইক্ষু, চামড়া, চা প্রভৃতি কৃষিপণ্যে সমৃদ্ধ। এ সমস্ত কৃষিজাত কাঁচামালের উপর নির্ভর করে আমাদের পাট, চিনি, কাগজ, চামড়া প্রভৃতি শিল্পগুলোকে সুদৃঢ় করা উচিত।

৩। কৃষি সহায়ক শিল্প / কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প ঃ দেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য উন্নত ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধপত্র প্রভৃতি একান্ড় আবশ্যক। সুতরাং আমাদের শিল্পনীতিতে কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

৪। রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপন ঃ বাংলাদেশের অভ্যন্ড়রীন বাজার অত্যন্ত ছোট। বাজারের সংকীর্ণতার কারণে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বাজারের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং দেশে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার। এটি আমাদের বর্তমান শিল্পনীতিরও অন্যতম লক্ষ্য। সুতরাং যে সমস্ত রপ্তানিমুখী শিল্পে আমাদের আপেক্ষিক সুবিধা আছে সে সমস্ত শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে এবং দেশের অর্থনীতি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

৫। শক্তি সম্পদ ঃ শক্তি সম্পদ শিল্পোন্নয়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য। শক্তি সম্পদের উন্নয়ন ব্যতিত কোন দেশের শিল্পায়ন সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশে শক্তি সম্পদের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অতএব প্রাকৃতিক গ্যাস ও পানি বিদ্যুৎ শিল্প উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৬। আমদানি বিকল্প শিল্প ঃ বাংলাদেশ বর্তমানে বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী আমদানী করে থাকে। ফলে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপক ঘাটতির সম্মুখীন। তাই আমাদের স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ার জন্য আমদানি কমাতে হবে। অতএব, দেশে আমাদানি বিকল্প শিল্প গড়ে তুলতে হবে।

৭। নিরাপত্তা বিধানকারী শিল্প ঃ প্রতিরক্ষার কথা বিবেচনা করে এবং দেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলা বারুদ কারখানা স্থাপন করতে হবে। কারণ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশে নিরাপত্তা বিধানকারী শিল্প স্থাপন করতে হবে।

৮। মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ঃ বাংলাদেশের শিল্পনীতিতে মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। মূলধনের স্বল্পতা, অনুন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব এবং বেকারত্বের হার বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকারখানা স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্প স্থাপন করা কঠিণ। অতএব ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরণের শিল্প কারখানা স্থাপিত হলে মূলধনের অভাবজনিত সমস্যা এবং গ্রামীণ বেকারত্ব বহুলাংশে দূরীভূত হবে।

৯। ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা ঃ শিল্পোন্নয়নের গতি বাড়াতে হলে শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য আমাদেরকে বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে হবে। সুতরাং শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য বাংলাদেশে ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১১.৩

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বাংলাদেশে শিল্প খাতের অবস্থান ও শিল্প কাঠামো বিশ্লেষন করুন।

২। বাংলাদেশে শিল্প খাতের উপখাত গুলো কি কি? বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নে খাতগুলোর অবদান মূল্যায়ন করুন।

৩। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৪। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন ধরনের শিল্পের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত? যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৪ : বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বৈদেশিক বাণিজ্যের পটভূমি ও বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।
- আমদানি কাঠামোর পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রপ্তানি কাঠামোর পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষন করতে পারবেন।
- বাণিজ্যিক ভারসাম্যের বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভারসাম্য ঘাটতির কারণ বিবৃত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভারসাম্যের ঘাটতি দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারবেন।

দুই বা ততোধিক স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য সংগঠিত হয় তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। বাস্তবে বৈদেশিক শ্রম বিভাগ ও ভৌগোলিক বিশেষায়নই হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, মানুষের গঠণ প্রভৃতি পার্থক্যের কারণে কোন বিশেষ দেশ বা রাষ্ট্র বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা লাভ করতে পারে। দেশ যে সব দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা পাবে সে দেশ সে সব দ্রব্য উৎপাদন এবং রপ্তানি করবে। বিনিময়ে যে সব দ্রব্য উৎপাদনের আপেক্ষিক সুবিধা কম সে সব দ্রব্য আমদানি করবে। এভাবেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য গড়ে উঠে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোগত পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি ঃ

কাঁচামাল রপ্তানি, শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য আমদানি, মুষ্টিমেয় পশ্চিমা দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, অল্পসংখ্যক কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি প্রভৃতি বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি প্রকৃতিতে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সেগুলো হল নিম্নরূপ ঃ

আমদানি কাঠামোর পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি ঃ

সম্প্রতি বাংলাদেশের আমদানি কাঠামোতে নিম্নরূপ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

১। প্রাথমিক পণ্যের আমদানি ব্যয় হ্রাস ঃ বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্যে প্রাথমিক পণ্যের গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কারণেই এরূপ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ সনে চাল ও গমের আমদানি ব্যয় ছিল ৪৮ কোটি ৯০ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং এটি ছিল মোট আমদানি ব্যয়ের ১৬.৩ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে চাল ও গমের আমদানি ব্যয় হ্রাস পেয়ে মোট আমদানি ব্যয়ের মাত্রা ৩.৯১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

২। শিল্পজাত পণ্যের আমদানি হার ঃ বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্যে শিল্পজাত পণ্যের আমদানি বেড়েছে। ফলে শিল্পজাত পণ্য আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ সনে শিল্পজাত পণ্যের আমদানি ব্যয় ছিল ৪৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এটি ছিল মোট আমদানি ব্যয়ের ১৬ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে শিল্পজাত পণ্যের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৩ কোটি ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয় এবং এটি ছিল মোট আমদানি ব্যয়ের ২২.৩৭ শতাংশ। এ বিষয়টি বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশে বর্তমানে আমদানি পরিবর্তক উন্নয়ন কৌশলের পরিবর্তে রপ্তানিমুখী উন্নয়ন কৌশল এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

৩। মূলধনী দ্রব্যের গুরুত্ব ঃ বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে মূলধনী দ্রব্যের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও মোট আমদানি ব্যয়ের শতাংশিক অনুপাত হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ সনে মূলধনী দ্রব্যের আমদানি ব্যয় ছিল ১০৯ কোটি মার্কিন ডলার এবং এটি ছিল মোট আমদানি ব্যয়ের ৩৬.৫ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে মূলধনী দ্রব্যের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৪২ কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত হয় এবং এটি ছিল মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ৬.৩০ ভাগ। অতএব, স্পষ্টত যে বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের গতি এখনও আগের মতই মন্থর রয়েছে।

৪। অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি ঃ মোটর গাড়ি, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য, দুধ, মাখন, চিনি, নারিকেল তৈল ইত্যাদি অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি ব্যয় সাম্প্রতিককালে খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ সনে এ সমস্ত দ্রব্যের আমদানি ব্যয় ছিল ৬৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এটি ছিল মোট আমদানি ব্যয়ের ২২ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এ সমস্ত দ্রব্যের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৩১৩ কোটি ৬০ লক্ষ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয় এবং এটি ছিল উক্ত বছরের মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ৫৮.৩৬ ভাগ। এ সমস্ড়দ্রব্যের অধিকাংশই বিলাস সামগ্রী যা বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র দেশে হওয়া অনুচিত।

রপ্তানি কাঠামোর পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি ঃ

১। প্রাথমিক পণ্যের গুরুত্ব হ্রাস ঃ বাংলাদেশের রপ্তানি খাতে প্রাথমিক পণ্যের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ সনে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ে কাঁচাপাট, চা, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত ইত্যাদি প্রাথমিক পণ্যের অবদান ছিল শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে মোট রপ্তানি আয়ে প্রাথমিক পণ্যের অবদান হ্রাস পেয়ে প্রায় ৫.৬ শতাংশে দাঁড়ায়।

২। শিল্পজাত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি ঃ বাংলাদেশের রপ্তানি কাঠামোতে সাম্প্রতিককালে শিল্পজাত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে শিল্পজাত পণ্যের অবদান ছিল মাত্র ৪৩ শতাংশ। ১৯৮৭-৮৮ সনে এটি বৃদ্ধি পেয়ে ৭৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে আমাদের রপ্তানি আয়ে শিল্পজাত পণ্যের অবদান আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৯৪.৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

৩। প্রচলিত পণ্যের অবদান হ্রাস ঃ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে প্রচলিত পণ্য তথা পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা ইত্যাদির অবদান হ্রাস পেয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ এ সমস্ত প্রচলিত পণ্য নিয়ে গঠিত ছিল। ১৯৮৭-৭৭ সনে এর অবদান ছিল শতকরা ৩৪.৩ ভাগ এবং ২০০৮-০৯ সনে এর অবদান হ্রাস পেয়ে শতকরা ২.৯৯ ভাগ দাঁড়িয়েছে।

৪। অপ্রচলিত পণ্যের অবদান বৃদ্ধি ঃ সাম্প্রতিককালে আমাদের রপ্তানি কাঠামোতে অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব সবিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ সনে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, চামড়া, হিমায়িত খাদ্য, সার, ন্যাফতা, ফার্নেস ওয়েল, শাক-সব্জি, হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য ইত্যাদি অপ্রচলিত দ্রব্যের অবদান ছিল শতকরা ৬৫.৭ ভাগ। ২০০৮-০৯ সনে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে অপ্রচলিত পণ্যের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অপ্রচলিত পণ্যের মধ্যে তৈরী পোশাকের গুরুত্ব সর্বাধিক। আমাদের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩৮.০২ শাতাংশ তৈরী পোশাক থেকে পাওয়া যায়।

৫। সীমিত সংখ্যক পণ্যো উপর নির্ভরশীলতা ঃ বাংলাদেশের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে তৈরী পোশাক, হিমায়িত খাদ্য ও নীট ওয়্যার রপ্তানি থেকে আমাদের মোট রপ্তানি আয়ের ৮২.২৪ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ক্রমশ অতি সীমিত সংখ্যক পণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিককালে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে খানিকটা কাঠামোতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রাথমিক পণ্যের আমদানি হ্রাস ও মূলধন দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ক্রমশ প্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব হ্রাস ও অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে শিল্পজাত পণ্যের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি বাংলাদেশের রপ্তানিখাতের কাঠামোগত পরিবর্তনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক।

বাণিজ্যিক ভারসাম্য ঃ

একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) কোন দেশের দৃশ্যমান আমদানি ও রপ্তানির মূল্যের একত্রিত হিসাবকে বাণিজ্যিক ভারসাম্য বলে। বস্তুজাত দ্রব্যের মোট আমদানি মূল্যের চেয়ে মোট রপ্তানি মূল্য বেশি হলে তাকে অনুকূল বাণিজ্যিক ভারসাম্য বলে। পক্ষান্ড়রে বস্তুজাত দ্রব্যের মোট আমদানি মূল্যের চেয়ে মোট রপ্তানি মূল্য কম হলে তাকে প্রতিকূল বাণিজ্যিক ভারসাম্য বলে।

সারণী ১ ঃ বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ বছর	পণ্য আমদানি ব্যয়	পণ্য রপ্তানি আয়	ঘাটতির পরিমাণ
২০০০-০১	৯৩৩৫	৬৪৬৭	২৮৬৮
২০০১-০২	৮৫৪০	৫৯৮৬	(−) ২৫৫৪
২০০২-০৩	৯৬৫৮	৬৫৪৮	(−)৩১১০
২০০৩-০৪	১০৯০৩	৭৬০৩	(−)৩৩০০
২০০৪-০৫	১৩১৪৭	৮৬৫৫	(−)৪৪৯২
২০০৫-০৬	১৪৭৪৬	১০৫২৬	(−)৪২২০
২০০৬-২০০৭	১৭১৫৭	১২১৭৮	(−)৪৯৭৯
২০০৭-০৮	২১৬২৯	১৪১১১	(−)৭৫১৮
২০০৮-০৯	২২৫০৭	১৫৫৬৫	(−)৬৯৪২

উৎস: অর্থমন্ত্রাণালয়, বিভিন্ন সালের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা।

উপরের ছক হতে দেখা যাচ্ছে বিগত এক দশকে প্রতি বছরই পণ্য আমদানি ব্যয় রপ্তানি আয় অপেক্ষা বেশি। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে নিয়মিকভাবে প্রতিকূল বাণিজ্যিক ভারসাম্য বিরাজমান এবং বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ

ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। একই চিত্র আমরা বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে লক্ষ্য করছি। কিন্তু তথ্যগুলো বিভিন্ন পরিসংখ্যানগ্রন্থে, অর্থনৈতিক সমীক্ষায় লক্ষ/ মিলিয়ন/ কোটি টাকায় প্রকাশ করাতে সারণীতে দেখানো হল না।

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্যে ঘাটতির কারণ ঃ

বাংলাদেশে প্রতিকূল বাণিজ্যিক ভাসাম্যের কারণগুলো নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

১। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস ঃ পাট ও পাটজাত দ্রব্য হতে পূর্বে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসতো। কিন্তু বর্তমানে পাটের বিকল্প সিনথেটিক ফাইবার আবিস্কৃত হওয়ায় বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

২। কৃষি নির্ভর রপ্তানি পণ্য ঃ বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের অনেকটাই এখনো কৃষি নির্ভর। কৃষি পণ্য পচনশীল বলে এর রপ্তানি চাহিদা শিল্পজাত পণ্য অপেক্ষা কম। কৃষি নির্ভর রপ্তানি পণ্য বাংলাদেশের প্রতিকূল বাণিজ্য ভারসাম্যের অন্যতম কারণ।

৩। উদার আমদানি নীতি ঃ বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য দাতা সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী আমাদের দেশেও উদার আমদানি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে আমাদের শিশু শিল্পগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে। এটিও আমাদের কম রপ্তানি আয়ের অন্যতম কারণ।

৪। অবকাঠামোগত বাঁধা ঃ বাংলাদেশের পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা এখনো অনুন্নত। তাছাড়া আমাদের বন্দরগুলোতে অপ্রতুল ধারণ ক্ষমতা, শ্রমিক ধর্মঘট, দূর্নীতি, জাহাজে মাল ভর্তি ও খালাসে বিলম্ব ইত্যাদি অসুবিধা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। আর এ সমস্ড় কারণে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

৫। রপ্তানি বাজারে সঙ্কীর্ণতা ঃ আমাদের রপ্তানি বাজার খুবই সঙ্কীর্ণ। মাত্র গুটিকয়েক দেশ আমাদের দেশ হতে পণ্য আমদানি করে। ফলে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ কম হয় এবং বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি দেখা দেয়।

৬। খাদ্য ঘাটতি ঃ বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হলেও দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রতি বছর আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। এটি আমাদের বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতির একটি কারণ।

৭। বিলাসবহুল ভোগ্যপণ্যের আমদানি বৃদ্ধি ঃ সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে মোটর গাড়ি, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য, মূল্যবান প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি বিলাসবহুল ভোগ্যপণ্যের আমদানি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে আমাদের আমদানি ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮। আমদানি নির্ভর রপ্তানি দ্রব্য ঃ আমাদের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। তৈরী পোশাক এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের রপ্তানি আয় বহুলাংশে আমদানি ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। এটিও আমাদের বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতির একটি কারণ।

৯। প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত ঃ বাংলাদেশকে এখনো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাইরের দেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ফলে বাণিজ্য শর্ত কোন সময়েই আমাদের অনুকূলে থাকে না। এ কারণে আমাদের বাণিজ্য ভারসাম্যেও ঘাটতি দেখা দেয়।

১০। চোরাচালান ঃ বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ ভারত ও বার্মা হতে প্রতি বছরেই শিল্পজাত এমন কি কৃষিজাত পণ্য ও চোরাচালনের মাধ্যমে আমাদের দেশে আসে। এতে একদিকে যেমন আমাদের দেশজ পণ্য এ সকল পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। অন্যদিকে তেমনি কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে আমদানিকৃত মূল্যবান পণ্য চোরাই পথে প্রতিবেশী দেশে চলে যাচ্ছে। এটি বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্যের প্রতিকূলতার অন্যতম কারণ।

বাণিজ্যিক ভারসাম্যে ঘাটতি দূরীকরণের উপায় ঃ

১। অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঃ অনুন্নত অবকাঠামোর জন্য আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য বাধাগ্রস্থ হয়। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদেরকে অবশ্যই বিদ্যুৎ, গ্যাস, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।

২। খাদ্যসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপাদান বৃদ্ধি ঃ আমদানি ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি রোধ করে ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদেরকে অবশ্যই খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। আমাদের অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান এখনো আমদানি নির্ভর। বাণিজ্যিক ভারসাম্যে ঘাটতি দূরীকরণের লক্ষ্যে সর্বাগ্রে আমাদেরকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

৩। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ আমাদের রপ্তানি আয়ের অনেকটাই কৃষি নির্ভর। কৃষি নির্ভর পণ্যের চাহিদা শিল্পজাত পণ্য অপেক্ষা কম। অতএব, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে আমাদের শিল্পখাতের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

৪। আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন ঃ বাংলাদেশে ভারী যন্ত্রপাতি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই আমদানির উপর নির্ভরশীল। এ সকল দ্রব্যাদি অভ্যন্ড়রীণভাবে উৎপাদন করতে পারলে আমাদের আমদানি ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এছাড়া যে সকল পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় দেশে সেসকল পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

৫। রপ্তানি বাজার সম্প্রসরাণ ঃ বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার খুবই সংকীর্ণ। রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করতে হলে অবশ্যই আমাদের মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে।

৬। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভারসাম্যে ঘাটতি দূর করতে হলে আমাদের পণ্য চোরাচালান রোধ খুবই জরুরী। চোরাচালান রোধ করা গেলে দেশে উৎপাদিত শিল্প পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। চোরাচালান রোধ করার লক্ষ্যে আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ঃ

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে এবং স্বনির্ভর হয়ে জাতীয় সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করতে হলে অবশ্যই রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে হবে। দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসাবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি সরকার দেশের রপ্তানি উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত জাতীয় রপ্তানি সংস্থা বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে আধা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে পুনর্গঠণ করেছন। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের প্রতিনিধিগণ ছাড়াও বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্য খাতের প্রতিনিধিরা এ বোর্ডের সদস্য থাকবেন। এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে ব্যুরোর শাখা অফিস রয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১। বৈদেশিক বাজার জরিপ ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো অভিজাত গবেষক ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে পণ্যের বাজার জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। জরিপে পণ্য সামগ্রীসমূহের বৈদেশিক বাজার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাবলি ব্যুরো রপ্তানিকরাকদেরকে অবহিত করে।

২। অর্থসংস্থানে সহায়তা ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো রপ্তানি বিষয়ে অর্থ যোগানের লক্ষ্যে বিভিন্ন অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান ও বীমা কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ সাধনে সহায়তা করে।

৩। নীতিমালা নির্ধারণ ঃ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য গতিশীল ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা ও কার্যপ্রনালী নির্ধারণ করে থাকে।

৪। পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের রপ্তানিকারকদেরকে পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করে থাকে। এতে রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারিত হয়।

৫। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ঃ রপ্তানিকারকদের ব্যবসায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ব্যুরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যুরো রপ্তানিকারকদেরকে ব্যবসায় চুক্তি সম্পাদন এবং রপ্তানি নির্ধারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা করে ।

৬। মান নিয়ন্ত্রণ ঃ বিদেশে রপ্তানিযোগ্য পণ্য সামগ্রীর গুণগত মান নির্ধারণ, পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুরো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৭। দপ্তরসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ঃ ব্যুরো রপ্তানিকারকদের বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও দূতাবাসসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে রপ্তানি বাণিজ্যের পথ সুগম করে থাকে।

৮। গবেষণা পরিচালনা ঃ ব্যুরো রপ্তানি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্য পরিচালনা করে এবং গবেষণালব্ধ প্রতিবেদনসমূহ রপ্তানিকারকদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করে।

৯। তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ে রপ্তানিকারকদের জন্য বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এবং সরবরাহ করে থাকে। ফলশ্রুতিতে রপ্তানি বাণিজ্যের পথ প্রসারিত হয়।

১০। যোগাযোগ ও পরিবহন বিষয়ে সহায়তা ঃ রপ্তানিকারকদেরকে রপ্তানির লক্ষ্যে যোগাযোগ ও পরিবহন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুরো সহযোগিতা প্রদান করে।

১১। বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা ঃ বিদেশে অবস্থিত দূতাবাসসমূহের সহযোগিতায় দেশীয় পণ্যের জন্য বাণিজ্য মেলার আয়োজন করে পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে ব্যুরো সহায়তা করে । এতে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের চাহিদা সম্প্রসারিত হয়।

১২। প্রদর্শনীসহ বিক্রয়কেন্দ্র ঃ বিদেশে অবস্থিত দূতাবাস সমূহের সহযোগিতায় দেশীয় পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপনে ব্যুরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৩। আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ ঃ ব্যুরো বাংলাদেশের উৎপাদন ও রপ্তানিকারকদেরকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণে সহায়তা করে।

১৪। অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা ঃ ব্যুরো দেশের অপ্রচলিত পণ্য সামগ্রী রপ্তানি বৃদ্ধিতে রপ্তানিকারকেদের সহায়তা করে।

১৫। বিদেশী প্রতিনিধিদেরকে সহায়তা ঃ বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আগত বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদেরকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যুরো সহায়তা প্রদান করে থাকে।

১৬। সমন্বয় সাধন ঃ রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগ সমূহের কার্যকর সমন্বয় সাধনে ব্যুরো রপ্তানিকারকদেরকে সহায়তা প্রদান করে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণেও সহায়তা প্রদান করে।

১৭। বিরোধ নিষ্পত্তি ঃ আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের মধ্যে ব্যবসাগত বিষয়ে কোন প্রকার সমস্যা দেখা দিলে তার নিষ্পত্তির জন্য ব্যুরো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১৮। বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুস্তিকা প্রণয়ন ঃ বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত পুস্তক, রপ্তানি সংক্রান্ত পাক্ষিক, মাসিক, বার্ষিক প্রতিবেদন, রপ্তানি ডাইরেক্টরি, ম্যাগাজিন ইত্যাদি প্রকাশ করে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১১.৪

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ

১। বাণিজ্য ভারসাম্য বলতে কি বুঝায়?
২। রাপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কি?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বাংলাদেশের আমদানি কাঠামোর পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি বর্ণনা করুন।
২। বাংলাদেশের রপ্তানি কাঠামোর পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি বর্ণনা করুন।
৩। বাণিজ্যিক ভারসাম্য বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশের বানিজ্যিক ভারসাম্যে ঘাটতি দেখা যায়?
৪। কি কি কারণে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভারসাম্যে ঘাটতি দেখা যায়?
৫। কিভাবে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্যে ঘাটতি দূর করা যায়?
৬। রপ্তানি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভূমিকা আলোচনা করুন।

পাঠ-৫: বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের শ্রেনীবিভাগ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা ও তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কে বিশ্লেষন করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে বাংলাদেশের প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন।

বৈদেশিক সাহায্য ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধন অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে বিপুল পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন হয় তা দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পাওয়া যায় না। তাই প্রয়োজন হয় বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের। অতএব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য বিভিন্ন দাতাদেশ এবং সংস্থা থেকে যে ঋণ ও অনুদান পাওয়া যায় তাকে বৈদেশিক সাহায্য বলে।

বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে জাতিসংঘের অভিমত হল, "বৈদেশিক সাহায্য দেওয়া হয় দুই আকারে- যথা- ক) ঋণ এবং (খ) অনুদান। ঋণ হল স্বল্প সুদে এবং দীর্ঘমেয়াদী যা নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে সুদসহ পরিশোধ করতে হয়। আর অনুদান কখনও পরিশোধ করার প্রয়োজন হয় না।"

বৈদেশিক সাহায্যের প্রকারভেদ ঃ

বিভিন্ন ধরণের বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ

১। প্রকল্প সাহায্য ঃ উন্নয়ণশীল দেশসমূহ চুক্তির মাধ্যমে উন্নতদেশ ও বিদেশী দাতা সংস্থাসমূহ থেকে প্রকল্প সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। নির্দিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয় বাবদ এ আর্থিক সাহায্য প্রদান করে থাকে।

২। পণ্য সাহায্য ঃ বৈদেশিক সাহায্য যখন পণ্যের আকারে প্রদান করা হয় তখন তাকে পণ্য সাহায্য বলে। দাতা সংস্থাসমূহ সাহায্য গ্রহণকারী দেশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে যন্ত্রপাতি, খাদ্য, শিল্পের কাঁচামাল, ঔষধপত্র ইত্যাদি পণ্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করে থাকে।

৩। কারিগরি সাহায্য ঃ উন্নত দেশ ও দাতা সংস্থাসমূহ অনেক সময় উন্নয়নশীল দেশসমূহকে প্রযুক্তি তথা কারিগরি সাহায্য প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে দক্ষ কারিগর, গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি তথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিল্পের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করা যায়।

৪। খাদ্য সাহায্য ঃ উন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহকে অনেক সময় বিশেষ প্রয়োজনে খাদ্য সাহায্য দিয়ে থাকে। সাহায্য গ্রহণকারী দেশ এ সকল খাদ্য দেশের মধ্যে বিক্রয় করে উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থান করে থাকে।

৫। সামরিক সাহায্য ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নতদেশ বিশেষত আমেরিকা এবং রাশিয়া উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অনেক সময় সামরিক এবং প্রতিরক্ষা খাতে সাহায্য প্রদান করে থাকে। এ ধরণের সাহায্যকে সামরিক সাহায্য বলে।

বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা ঃ

উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই বিদেশ থেকে কিছু না কিছু সাহায্য গ্রহন করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড হল্যান্ডের নিকট থেকে মূলধন নিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ থেকে মূলধন সংগ্রহ করেছে এবং বিংশ শতাব্দীতে চীন, কিউবাসহ অন্যান্য দেশও রাশিয়া থেকে সাহায্য লাভ করেছে। বিদেশে ঋণদানের ফলে ঋণদানকারী দেশগুলোও উপকৃত হয়। সাধারণত উন্নত দেশের শিল্পকাঠামো এমনভাবে গঠিত যে এগুলো অনুন্নত দেশগুলোকে শিল্পোন্নত করে নিজ দেশের দ্রব্য সামগ্রীর জন্য বাজার সৃষ্টি করে তোলে।

অন্যদিকে বাংলাদেশে জনগণের মাথাপিছু আয় স্বল্প, ফলে এখানে সঞ্চয় ও মূলধন গঠণের হারও নিম্ন। তাই এদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১। উন্নত প্রযুক্তি আমদানি ঃ পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলো বর্তমানে বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারকসমূহ উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে। বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে বাংলাদেশে এ সমস্ড় যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পোন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে পারে।

২। আমদানি চাহিদা পূরণ ঃ বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের গতি অত্যন্ত মন্থর। ফলে আমাদের ভোগ্যপণ্য ও পুঁজিদ্রব্য উভয় ক্ষেত্রেই আমদানির প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। আমাদানির ব্যয়ভার মিটাতে হলে আমাদেরকে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া আপাতত উপায় নেই।

৩। খাদ্য সমস্যা ঃ বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রতি বছর আমাদেরকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। ফলে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশ খাদ্য সাহায্য গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চখ-৪৮০ এর আওতায় বাংলাদেশকে প্রচুর খাদ্য সাহায্য প্রদান করে।

৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ঃ বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি দুর্যোগ বাংলাদেশের একটি নিত্য নৈমিত্তিক সমস্যা। অনেক সময় সরকারের পক্ষে নিজস্ব সম্পদের দ্বারা এ সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভবপর হয় না। ফলে বাধ্য হলে সরকারকে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

৫। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে হলে দেশে দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো গঠণ করতে হবে। কিন্তু এর জন্য যে বিপুল পরিমাণ মূলধন ও কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন তা বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া আমাদের পক্ষে যোগান দেয়া সম্ভব নয়।

৬। মূলধন বৃদ্ধি ঃ বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম বলে আমাদের জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ অত্যন্ত নগন্য। সুতরাং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন সঞ্চয়ের স্বল্পতার দরুণ বৈদেশিক মূলধন অভ্যন্তরীন মূলধনের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা হলে দেশের উন্নয়ন দ্রুততর হবে।

৭। মুদ্রাস্ফীতি রোধ ঃ উন্নয়নের প্রথম যুগে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। বৈদেশিক সাহায্য মুদ্রাস্ফীতির এ চাপকে হ্রাস করতে সাহায্য করে। কারণ বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য আমদানি করে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ কিছুটা হ্রাস করা যায়।

৮। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ঃ বর্তমানে আমাদের দেশে বেকার সমস্যা যে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তার সমাধান করতে হলে দ্রুত অধিক পরিমাণে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। বিদেশি সাহায্য ও ঋণের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।

৯। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করতে হলে আমাদেরকে বিদেশ থেকে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হবে। এর জন্য বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা লাভের দুটি পথ রয়েছে; এদের একটি হল বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অপরটি বৈদেশিক বাণিজ্য। কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে কেবল রপ্তানি বৃদ্ধি দ্বারা প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করা এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। সুতরাং বৈদেশিক ঋণের সাহায্যে আমরা বৈদেশিক মুদ্রার অভাব খানিকটা কাটিয়ে উঠাতে পারি।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ বৈদেশি সাহায্য ছাড়া দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তবে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণে সুফলের পাশাপাশি রয়েছে নানা কুফল বা সমস্যা। তাই আমাদে দ্রুত অভ্যান্তরীণ সম্পদ আহরণেল দিকে নজর দিতে হবে। অর্থাৎ ধীরে ধীরে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে হবে।

বৈদেশিক সাহায্যের সীমাবদ্ধতা ঃ

বিভিন্ন দাতাদেশ ও সংস্থাসমূহ বৈদেশিক সাহায্যে নানা শর্ত জুড়ে দিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে। ফলে অর্থনীতিতে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের অসুবিধাসমূহ নিম্নে আলোচিত হল ঃ

১। বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ঃ বৈদেশিক সাহায্য অনেক সহময় উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করে। বিদেশী ঋণ দাতারা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালায়। তারা অনেক সময় দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দলগুলোকে প্রভাবিত করে নিজ দেশের স্বার্থ উদ্ধার করে নেয়। এতে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রসার লাভ করে।

২। অসংগতিপূর্ণ শর্তারোপ ঃ উন্নত দেশগুলো থেকে যে সাহায্য আসে তার সঙ্গে প্রায়ই নানারূপ শর্ত জড়িত থাকে বলে উন্নয়নশীল দেশগুলো এর দ্বারা বিশেষ লাভবান হয় না। বৈদেশিক সাহায্যের সঙ্গে সাধারণত নিম্নোক্ত শর্তগুলো জড়িত থাকে।

ক) সাহায্য গ্রহণকারী দেশকে উক্ত ঋণের সাহায্যে ঋণ প্রদানকারী দেশের পণ্য ক্রয় করতে হবে।

খ) ঋণ গ্রহণকারী দেশকে উক্ত পণ্য আনয়নে ঋণ প্রদানকারী দেশের জাহাজ ও বীমা কোম্পানীগুলোকে ব্যবহার করতে হবে।

গ) যে প্রকল্পের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে তা ঋন প্রদানকারী দেশের পছন্দমাফিক হতে হবে।

৩। অধিক দাম ঃ ঋণ গ্রহণকারী দেশ দাতা দেশ থেকে যে সমস্ত পণ্য আনয়ন করে তার দাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজার দাম অপেক্ষা বেশী হয়ে থাকে।

৪। অনিশ্চয়তা ঃ অর্থনীতি বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হলে দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কারণ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

৫। উপদেষ্টা নিয়োগ ঃ বিদেশী পুঁজিপতিরা সাধারণত ঋণ গ্রহনকারী প্রকল্পে উচ্চ বেতনে তাদের দেশের উপদেষ্টা নিয়োগ করে থাকে। তাছাড়া কোন উচ্চ পদে সাহায্য গ্রহণকারী দেশের লোক নিয়োগ করে না। ফলে দেশীয় বিশেষজ্ঞ উন্নত প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায় না।

৬। উচ্চ সুদের হার ঃ বৈদেশিক ঋণের সুদের হার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশী। তাই ক্রমাগত বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহ কার্যত ঋণ ও সুদের জালে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে পুরাতন ঋণ ও সুদ পরিশোধের জন্য নতুন ঋণ গ্রহণ করতে হচ্ছে।

৭। মুদ্রাস্ফীতি ঃ বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের নামে অনেক সময় উন্নয়নশীল দেশে অতিরিক্ত অর্থ আগমনের ফলে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনেক ক্ষেত্রে আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

৮। শ্রম শক্তির অপচয় ঃ অধিক পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্যের আগমন উন্নয়নশীল দেশগুলোর আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে, অধিক পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেরা আর কিছুই করতে চায় না।

৯। পরনির্ভরশীলতা ঃ বৈদেশিক সাহায্যকে কখনই উন্নয়নশীল দেশের ভারী শিল্পের উন্নয়নে ব্যয় করতে দেয়া হয় না। ফলে বৈদেশিক ঋণের সাহায্যে উন্নয়নশীল দেশগুলো কোন দিনই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পায় না। ভারী যন্ত্রপাতির জন্য এ সমস্ড় দেশকে চিরকাল উন্নত দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় ।

১০। কারিগরি সাহায্যের মাধ্যমে শোষণ ঃ অনেক সময় বৈদেশিক ঋণ কারিগরি সাহায্যের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। কারিগরি সাহায্যের মাধ্যমে যদি উন্নয়নশীল দেশের লোকদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের জন্য বিদেশে পাঠানো হয় তবে নিঃসন্দেহে এরূপ কর্মসূচীর দ্বারা উন্নয়নশীল দেশগুলো উপকৃত হয়। কিন্তু কারিগরি সাহায্যের নামে উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে দক্ষ কারিগর প্রেরণ করা হলে এবং সে সকল দক্ষ কারিগর পরবর্তীতে নিজ দেশে ফিরে না আসলে তার দ্বারা উন্নয়নশীল দেশগুলো কতটুকু উপকৃত হয় সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। বিদেশী দক্ষ কারিগরদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির চিরপরিচিত অভিযোগ ছাড়াও এ সমস্ত কারিগর নিয়োগ অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক নয়। কারণ বিদেশী দক্ষ কারিগরদেরকে অস্বাভাবিক উচ্চহারে বেতন দিতে হয় এবং এর ফলে অবশেষে দেখা যায় যে, প্রকল্পের জন্য যে সাহায্য দেয়া হয়েছিল তার অধিকাংশ কেবল বিদেশী কারিগরদের বেতন প্রদানেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া এ সমস্ত বিদেশী কারিগরদের উচ্চ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে প্রদর্শন প্রভাব বিস্তার করে তার ফলে এ সমস্ত দেশে ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এটি উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠণের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এ সমস্ত দেশের উন্নয়নের গতি মন্থর করে তোলে।

উপর্যুক্ত অসুবিধার কারণে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করতে হবে এবং ধীরে ধীরে বৈদেশিক সাহায্য হ্রাসের পদক্ষেপ নিতে হবে।

বৈদেশিক বেসরকারী বিনিয়োগ বা প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ঃ

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ খুবই কম সেখানে বিদেশী পুঁজি প্রবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। বিদেশী পুঁজি প্রবাহ বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমেও আসতে পারে। কিন্তু প্রবৃদ্ধিরন উচ্চ হারের জন্য বৈদেশিক সাহায্য যথেষ্ট নয় এজন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত বিদেশী বিনিয়োগ। ব্যক্তিগত বা বেসরকারি বৈদেশিক বিনিয়োগ বলতে তাকেই বুঝায় যখন কোন দেশের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য কোন দেশের প্রকল্পে ব্যয় করে। বর্তমনে বিশ্বে সাধারণত বহুজাতিক কোম্পানীগুলো উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে। এ ধরণের বিনিয়োগ মূলধন, উৎপাদন কৌশল, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি আকারে সংঘটিত হয়।

বাংলাদেশে আগত বিদেশী বিনিয়োগকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। (ক) প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ, (খ) পোর্টফলিও বিনিয়োগ বা পরোক্ষ বিনিয়োগ। প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হচ্ছে এমন এক ধরণের বিনিয়োগ যেখানে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা সরাসরি দেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা ক্ষেত্রে অর্থ খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করে। পোর্টফলিও বা পরোক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা দেশের পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় করে। প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ স্থায়ী প্রকৃতির কিন্তু পোর্টফলিও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ যে কোন সময় পুঁজি খাটিয়ে ফেরত নিয়ে যেতে পারে। এই বিবেচনায় প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ শিল্পোন্নয়নে অধিক ভূমিকা পালন করে। ২০০১ সনে বাংলাদেশে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৫ কোটি ৪৫ লক্ষ মার্কিন ডলার। আর ২০০৮ সনে বাংলাদেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০৮ কোটি ৬৩ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং এটি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলছে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ হতে বাংলাদেশের প্রাপ্ত সুবিধা ঃ

পূর্বে স্বল্পোন্নত দেশগুলো বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (F. D. I.) গ্রহনে উৎসাহী ছিল না। কিন্তু আজ আর সে অবস্থা নেই। বর্তমানে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। স্বাভাবিক উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বাভাবিক উন্নয়নশীল দেশে বিদেশি উন্নত প্রযুক্তির অনুপ্রবেশের ফলে দেশীয় শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞানের মান উন্নত হয়। তারা উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখে। এতে স্বাগতিক দেশে শ্রমের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

২। জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঃ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বাগতিক দেশের শ্রমের ক্ষমতা ও উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বাগতিক দেশের জাতীয় আয় বাড়ে।

৩। বেকার সমস্যার সমাধান ঃ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (F. D. I.) দ্বারা স্বাগতিক দেশে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ফলে ঐ সমস্ত দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় ও বেকার সমস্যার প্রকোপ হ্রাস পায়।

৪। লেনদেনের প্রতিকূল তারতম্যের উন্নয়ন ঃ আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য প্রায় সবসময়ই উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রতিকূলে থাকে। লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূর করতে হলে ঐ সমস্ড় দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ দ্বারা প্রায় ক্ষেত্রেই স্বাগতিক দেশের আমদানি প্রতিস্থাপনকারী দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এতে স্বাগতিক দেশের আমদানি হ্রাস পায় ও তাদের লেনদেনের ভারসাম্যের উন্নতি ঘটে।

৫। মূলধনের অনুপ্রবেশ ঃ অভ্যন্তরীন সঞ্চয়ের স্বল্পতার কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূলধনের তীব্র সংকট রয়েছে। মূলধনের অভাবে উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের অনুপ্রবেশ ঘটে। এতে এ সমস্ত দেশের উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পায়।

৬। আন্ড়র্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঃ বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলো আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যে সংযুক্তি আছে তার সুবিধাটুকু স্বাগতিক দেশ বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে আপনা আপনিই পেয়ে যায়। এতে স্বাগতিক দেশের আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

৭। উন্নত প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার অনুপ্রবেশ ঃ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ফলে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উন্নত ব্যবস্থাপনা নীতি স্বাগতিক দেশেও প্রচলিত হয়। এতে স্বাগতিক দেশের শিল্প ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক মান উন্নত হয়।

বাংলাদেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপায় ঃ

বাংলাদেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ এর সাহায্যে আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদের স্বল্পতা কাটিয়ে উঠতে পারি। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

১। দূর্নীতি দমন ঃ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাংলাদেশের সকল স্তরে দূর্নীতি দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দূর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠণ আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য হলেও আমরা এখনও পর্যাপ্ত দূর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

২। সরকারী কবর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র এখনও কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। বিদেশী উদ্যোক্তারা বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বিনিয়োগে অনুৎসাহিত হয়। সুতরাং সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক।

৩। শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ বাংলাদেশের শ্রমের দক্ষতা অত্যন্ত কম। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রক্ষিণের মাধ্যমে শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪। রাজনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস ঃ অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করতে হবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক দলের যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে ।

৫। শিল্পমেলায় অংশগ্রহণ ঃ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শিল্পমেলায় অংশগ্রহণ করে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা যায়। বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো দেশের বিনিয়োগের সুবিধাগুলো সম্পর্কে প্রচারাভিযান চালানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১১.৫

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ

১. বৈদেশিক সাহায্য কি?
২. প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বলতে কি বুঝা?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের প্রকারভেদগুলো বর্ণনা করুন।
২. বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা ও তার সীমাবদ্ধতাগুলো ব্যাখ্যা করুন ।
৩. বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ভূমিকা বিশ্লেষন করুন ।
৪. বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপায়গুলো বর্ণনা করুন ।

পাঠ-৬ : বাংলাদেশের মুদ্রা ও মূলধন বাজার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- মুদ্রাবাজার ও মুলধন বাজারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করতে পারবেন।
- মুদ্রাবজারের উপাদানসমূহের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মুদ্রাবাজারের ত্রুটিসমূহ নির্ণয় করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মুদ্রাবজারের উন্নয়নের পথ নির্দেশ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মূলধন বাজারের উপাদানসমূহের ধারনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মূলধন বাজারের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মূলধন বাজারের উন্নয়নের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুদ্রাবাজার ও মূলধন বাজারের মধ্যে পার্থক্য ঃ

যে সমস্ড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদী ঋণ নিয়ে কারবার করে তাদের সমষ্টিকে মুদ্রাবাজার বলে। সাধারণত স্বল্প ঋনের বাজারকে মুদ্রাবাজার বলে। স্বল্পমেয়াদ বলতে সাধারণত, অনধিক একবছর সময়কালকে বোঝায়। বিনিময় বিল, প্রতিশ্রুতি বা এ, ট্রেজারী বিল, সঞ্চয় সার্টিফিকেট প্রভৃতি স্বল্প মেয়াদি ঋণপত্র মুদ্রাবাজারে ঋণ আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অন্য যে কোন উপায়ে স্বল্পমেয়াদি ঋনের আদান-প্রদান হলেই তা মুদ্রাবাজারের অন্তর্ভূক্ত হবে। অতএব দেশের সকল স্বল্প মেয়াদী ঋনের দাতা ও গ্রহীতার সমষ্টিকে নিয়ে মুদ্রাবাজর গঠিত হয়।

পক্ষান্তরে, যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে কারবার করে তাদের সমষ্টিকে মূলধন বাজার বলে। অর্থাৎ মূলধন বাজার বলতে দীর্ঘমেয়াদি ঋনের বাজারকে বোঝায়। মূলধন বাজারে শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি দীর্ঘ মেয়াদী ঋনের আদান-প্রদান হয়। মূলধন বাজারে যৌথ মূলধন কোম্পানি , বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনসমূহ শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ছেড়ে মূলধন সংগ্রহ করে।

নিম্নে মুদ্রাবাজার ও মুলধন বাজারের মধ্যে পার্থক্য আরও স্পষ্ট করা হল,

১। মুদ্রাবাজার কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী ঋণ নিয়ে কারবার করে মুদ্রাবাজারের অন্যতম সদস্য বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত স্বল্পমেয়াদী ঋন প্রদান করে। পক্ষান্তরে, মুলধনবাজার দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিয়ে কারবার করে।

২। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আমানত নিয়ে মুদ্রাবাজারের তহবিলের সিংহভাগ গঠিত হয। পক্ষান্তরে মূলধন বাজারের প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব ঋনপত্র ইস্যু করে মূলধনের সিংহভাগ সংগ্রহ করে।

৩। মুদ্রাবাজারের সদস্যগন দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের স্বল্পমেয়াদী চাহিদার জন্য ঋন প্রদান করে । পক্ষান্তরে মূলধন বাজারের সদস্যগণ ভারী শিল্পকারখানা নির্মাণ ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে।

৪। মুদ্রবাজারে ঋণপত্রে হিসেবে সাধারণত বিনিময় বিল, প্রতিশ্রুতিপত্র, ট্রেজারি বিল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে মূলধন বাজারে শেয়ার , ডিবেঞ্জার ইত্যাদি ঋণপত্র হিসেবে গৃহীত হয়।

৫। বাণিজ্যিক ব্যাংক, দেশীয় ব্যাংক, বিলের দালাল প্রভৃতি স্বল্পমেয়াদী ঋণদানকারী সংস্থাগুলো হচ্ছে মুদ্রাবাজারের সদস্য, পক্ষান্ড়রে শিল্প ব্যাংক, গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা, শিল্প ঋণ সংস্থা ইত্যাদি যারা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ নিয়ে কারবার করে তারাই মূলধন বাজারের তহবিলের যোগান দাতা।

মুদ্রাবাজারের উপাদানসমূহঃ

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদী ঋণ নিয়ে কারবার করে তাদের সমষ্টিকে মুদ্রাবাজার বলে। নিম্নে মুদ্রাবাজারের উপাদানসমূহ আলোচনা করা হল।

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংকঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করে। এটি প্রকৃতপক্ষে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কেন্দ্র করেই দেশের মুদ্রাবাজার আবর্তিত হয়। দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২। বাণিজ্যিক ব্যাংকঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দেশের মুদ্রা বাজারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ সমস্ত ব্যাংক স্বল্পমেয়াদী ঋণ নিয়ে কারবার করে। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মুদ্রাবাজারের প্রধান ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা হিসেবে কাজ করে।

৩। সরকার ঃ বাংলাদেশ সরকারও দেশের মুদ্রা বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অনেক সময় সরকার মুদ্রাবাজার থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার সাধারণত ট্রেজারি বিল বন্ড ইত্যাদি বিক্রি করে মুদ্রাবাজার থেকে ঋণ গ্রহণ করে।

৪। চাহিবামাত্র দেয় ঋণের বাজারঃ চাহিবামাত্র দেয় ঋনের বাজারে অতি অল্প সময়ের জন্য ঋন প্রদান করা হয় এবং চাহিবামাত্র এই ঋণ পরিশোধ করতে হয়। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ নগদ টাকা হাতে না রেখে এ ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে এবং নগদ টাকার প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে এগুলো ফেরত নিতে পারে। বিনিময় বিলের দালাল, স্টকের দালাল প্রমুখ এ ধরনের ঋনের গ্রাহক। নগদ টাকার একাংশ এরূপ স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ করে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে।

৫। বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানঃ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উদ্বৃত্ত তহবিল স্বল্পমেয়াদি ঋনপত্রে বিনিয়োগ করে সুদ উপার্জন করে থাকে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মুদ্রাবাজার থেকে ঋণও গ্রহণ করে। কাঁচামাল ক্রয় বা অনুরূপ সাময়িক উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মুদ্রাবাজার থেকে প্রয়োজন বোধে ঋন গ্রহণ করে।

৬। বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহঃ বীমা কোম্পানি , সঞ্চয়ী ব্যাংক , ট্রাস্ট, কোম্পানি প্রভৃতি দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানে নিয়োজিত থাকলেও এরা স্বল্পমেয়াদী ঋণও প্রদান করে। এজন্য এদেরকে মুদ্রাবাজারের অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচনা করা হয়।

৭। বিশেষ ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহঃ শিল্প ব্যাংক , কৃষি ব্যাংক , সমবায় ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি ঋনের পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদী ঋণ ও প্রদান করে এ কারনে এদেরকেও মুদ্রাবাজারের অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

৮। স্বল্পমেয়াদী ঋনের বাজারঃ স্বল্পমেয়াদি ঋণ চাহিবামাত্র দেয় ঋনের তুলনায় আরেকটু বেশি সময়ের জন্য দেয়া হয়। সাধারণত এ ধরনের ঋনের মেয়াদ ১৫ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে। স্বল্পমেয়াদি ঋনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এদের সাহায্যে একদিকে যেমন ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে অন্যদিকে, এতে ব্যাংকের তারল্য ও বজায় থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এই স্বল্পমেয়াদি ঋনের প্রধান যোগানদার , ব্যবসায়ী, বিনিময় বিলের দালাল, স্টকের দালাল প্রমুখ ব্যক্তিরা স্বল্পমেয়াদি ঋনের প্রধান গ্রাহক।

৯। দেশীয় অপ্রতিষ্ঠানিক ব্যাংক সমূহঃ গ্রাম্য মহাজন, গ্রাম্য বেপারী ও ব্যবসায়ী, তালিকা-বর্হিভূত ছোট ছোট ব্যাংক প্রভৃতি এর আওতায় পড়ে। এরা কৃষক ও ছোটছোট ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ প্রদান করে। এ সমস্ড় ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য নয়, এ ধরনের ব্যাংকের উপস্থিতি অনুন্নত মুদ্রা বাজারসমূহের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১০। গ্রাম্য মহাজন ও আত্মীয় স্বজনঃ বাংলাদেশের কৃষি ঋনের বেশির ভাগ অংশই আত্মীয় স্বজন, ব্যবসায়ী, মহাজন প্রভৃতি অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে সংগৃহীত হয়। এ সমস্ত ঋনের জন্য খুব চড়া হারে সুদ গ্রহন করা হয়।

বাংলাদেশের মুদ্রা বাজারের ত্রুটি সমূহঃ

দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাবাজারের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের মুদ্রাবাজার উন্নত নয়। এটি এ সমস্ড় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা। নিম্নে বাংলাদেশের মুদ্রাবজারের বৈশিষ্ট্য গুলো আলোচনা করা হলঃ

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তৃত্বের অভাবঃ বাংলাদেশে ঋনদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তেমন কর্তৃত্ব থাকে না। এই সমস্ত দেশে তফসিলী ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তৃত্বাধীনে থাকলে ও দেশীয় ব্যাংকগুলোর উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোনরূপ হাত নেই। ফলে অনুন্নত দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময় ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়।

২। অনুন্নত ব্যাংক ব্যবস্থাঃ অনুন্নত ব্যাংক ব্যবস্থা বাংলাদেশের মুদ্রাবাজারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । দেশের মুদ্রাবাজারে পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যাংক প্রতিষ্ঠান না থাকায় গ্রাম্য মহাজন ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ঋণদান কার্য সম্পাদন করে থাকে। ফলে অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঋনের চাহিদা পুরণ হয় না।

৩। গতিশীলতার অভাবঃ দেশের সকল অংশে ঋনের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সম্পদের গতিশীলতা আবশ্যক । কিন্তু অনুন্নত মুদ্রাবাজারে সম্পদের গতিশীলতা থাকে না। ফলে অনুন্নত মুদ্রাবাজারে কোথায় ও ঋনের অভাব আবার কোথায়ও ঋনের প্রাচুর্য দেখা যায়।

৪। ক্ষুদ্রায়তনঃ অনুন্নত মুদ্রাবাজার আয়তনে ছোট হয়। ফলে পর্যাপ্ত সংখ্যক ঋণদানকারী সংস্থার অভাবে বাংলাদেশের মুদ্রাবাজারে জনসাধারনের প্রয়োজনীয় ঋনের চাহিদা অপূর্ণ থেকে যায়।

৫। ঋণের নিরাপত্তার অভাবঃ ঋনের নিরাপত্তার অভাব অনুন্নত মুদ্রাবাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাল জামানতের উপর ঋনের নিরাপত্তা নির্ভর করে। কিন্তু বাংলাদেশের মুদ্রাবাজারে উৎকৃষ্ট জামানতের একান্ত অভাব রয়েছে।

৬। স্থিতিশীলতার অভাবঃ মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল হওয়া বাঞ্চনীয় । কিন্তু বাংলাদেশের মুদ্রাবজারে স্থিতিশীলতার অভাব দেখা যায়। ফটকা ব্যবসায়ীদের প্রভাব অনুন্নত মুদ্রাবজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৭। প্রতিযোগিতার অভাবঃ মুদ্রাবাজারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধে প্রতিযোগিতা থাকা বাঞ্চনীয়। কিন্তু অনুন্নত মুদ্রাবাজারে প্রতিযোগিতা থাকে না।

৮। অসংগঠিত বিলের বাজারঃ অনুন্নত মুদ্রাবাজারে সুসংগঠিত বিলের বাজার থাকে না। পর্যাপ্ত পরিমাণ বিলের অভাবে অনুন্নত মুদ্রাবাজারে ঋনের আদান-প্রদান ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশের মুদ্রাবাজারে উন্নয়নের উপায়ঃ

বাংলাদেশের উন্নয়নশীল অর্থনীতির আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে হলে আমাদের মুদ্রাবাজারের উন্নতি সাধন করা একান্ত অপরিহার্য। আমাদের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋনের প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমাদের ঋণ দান সংস্থাগুলোকে সুসংহত ও উন্নত করতে না পারলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে। নিম্নোক্ত উপায়ে আমাদের মুদ্রাবাজারের উন্নতি সাধন করা যেতে পারে।

১। বাংলাদেশের ব্যাংকের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহনঃ দেশের মুদ্রবাজার নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। অপরাপর ঋণদানকারী সংস্থাগুলো যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ মোতাবেক চলে সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

২। দেশীয় অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণঃ দেশীয় ব্যাংকগুলো আমাদের মুদ্রবাজারের প্রধান অংশ। কিন্ত এ প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং এরা যাতে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে সে বিষয়ে অবশ্যই নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৩। তারল্য ও স্থিতিস্থাপকতাঃ মুদ্রাবাজারের তারল্য ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় তারল্য ও উপযুক্ত স্থিতিস্থাপকতা উন্নত মুদ্রা বাজারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এতে ব্যবসায়ীরা সহজে বিল ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা সংগ্রহ করতে পারে এবং প্রয়োজন অনুসারে অর্থের যোগানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হয়।

৪। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ মুদ্রাবাজারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে । অতএব, গ্রামাঞ্চলে যাতে ব্যাংক ব্যবসায় প্রসারিত হয় সেদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজর দেওয়া উচিত। সরকারী সাহায্যপুষ্ট বিশেষ ঋণদানকারী সংস্থার সংখ্যাও অবিলম্বে বৃদ্ধি করতে হবে।

৫। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতাঃ মুদ্রাবাজারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যাতে সুসংহতভঅবে কাজ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

৬। বিনিময় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণঃ আমাদের দেশের বিনিময় ব্যাংকগুলো যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ অনুসারে চলে এবং জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দেশীয় ব্যাংকগুলোর মত এ ব্যাংকগুলোকেও অবশ্যই আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে।

৭। সুস্থ্য প্রতিযোগিতাঃ মুদ্রবাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করতে হবে । সরকারি সুযোগ সুবিধা যাতে সকল ব্যাংক সমানভাবে ভোগ করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৮। ঋণ খেলাপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণঃ বাংলাদেশের আর্থিক খাতে খেলাপি ঋণ একটি মারাত্নম সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। সুস্থ মুদ্রাবাজার গঠন করতে হলে এরূপ ঋণ খেলাপীর দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

৯। বিদেশী ব্যাংককে উৎসাহ প্রদানঃ দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি বিদেশী ব্যাংক কর্মরত রয়েছে। বিদেশী ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাদের মাধ্যমে দেশে বিদেশী তহবিলের অনুপ্রবেশ ঘটবে।

১০। গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক স্থাপনঃ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখন ও ব্যাংক ব্যবস্থা প্রসারিত হয়নি। সুতরাং দেশের পল্লী অঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে হবে।

১১। বেসরকারি খাতে ব্যাংক স্থাপনঃ ব্যাংকিং খাতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে বেসরকারি ব্যাংকের সম্প্রসারণ ঘটানো প্রয়োজন।

১২। সেকেন্ডারি মার্কেটের প্রসারঃ বন্ড ও বিলসমূহ ছাড়ার পর সেগুলো সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয় বিক্রয় হয়। সুতরাং সেকেন্ডারি মার্কেট প্রসারিত হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তারল্য বৃদ্ধি পাবে ও তারা অধিক পরিমানে ঝুঁকি গ্রহনে সক্ষম হবে।

১৩। ব্যাংকিং অভ্যাস গঠনঃ মুদ্রা বাজারের উন্নতি করতে হলে দেশের জনসাধারনের মধ্যে ব্যাংকিং অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এর ফলে ঋণপত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং ঋণপত্রের বাজার সম্প্রসারিত হবে।

বাংলাদেশের মূলধন বাজারঃ

যে বাজারে দীর্ঘমেয়াদী ঋনের লেনদেন হয় তাকে মূলধনবাজার বলে। মূলধন বাজারে কোম্পানির শেয়ার , বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ঋনের লেনদেন হয় তাকে মূলধন বাজার বলে। সুতরাং মূলধন বাজারে কোম্পানির শেয়ার, বন্ড ডিবেঞ্চার ইত্যাদির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ঋনের লেনদেন সংঘটিত হয়। যৌথ মূলধনী কোম্পানীগুলো মূলধন বাজারে শেয়ার বিক্রি করে তাদের কারবারে মূলধন বা ইকুইটি, সংগ্রহ করে , মূলধন বাজারের অধীনে বিভিন্ন স্থানে স্টক একচেঞ্জ স্থাপিত হয় । বাংলাদেশ বর্তমানে দুটি স্টক একচেঞ্জ রয়েছে। এদের একটি হল ঢাকা স্টক একচেঞ্জ ও অপরটি চট্রগ্রাম স্টক একচেঞ্জ।

১। ঢাকা স্টক একচেঞ্জঃ পাকিস্তান আমলেই ঢাকায় স্টক একচেঞ্জ স্থাপিত হয়। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় 'পূর্ব' পাকিস্তান স্টক একচেঞ্জ এসোসিয়েশন লিমিটেড নিবন্ধিত হয় এবং পরবর্তীতে ঢাকা স্টক একচেঞ্জ নামকরণ করা হয়। ১৯৭৬ সালে মাত্র ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ঢাকা স্টক একচেঞ্জের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হয়। সরকার মনোনীযত ১২ জন সদস্যসহ মোট ২৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কাউন্সিল দ্বারা ঢাকা স্টক একচেঞ্জের কার্যাবলি পরিচালিত হয়।

১৯৮৬ সালের মার্চ মাসের শেষে ঢাকা স্টক একচেঞ্জের তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৮২ এবং তালিকাভূক্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমান ছিল ২৬৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। ২০০০ সালের মার্চ মাস শেষে ঢাকা স্টক একচেঞ্জের তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪১ টিতে এবং ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে ৩১১৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। ২০১০ সালের মার্চ মাসের শেষে ঢাকা স্টক একচেঞ্জের তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৪৩৭ এবং তালিকাভূক্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমান ছিল ৫৬৬৫৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

২। চট্রগ্রাম স্টক একচেঞ্জঃ বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্টক একচেঞ্জটি চট্রগ্রামে স্থাপিত হয়েছে। চট্রগ্রাম স্টক একচেঞ্জ একটি লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ১৯৯৫ সালে নিবন্ধিত হয়। সরকার কর্তৃক মনোনিত ৬ জন সদস্যসহ ১৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক চট্রগ্রাম স্টক একচেঞ্জের কার্যাবলি পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৯৫ সালে চট্রগ্রাম স্টক একচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৬১ এবং সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমান ছিল ১০৩৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ,২০০০ সালের মার্চ মাস শেষে চট্রগ্রাম স্টক একচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৮৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায। ২০১০ সালের মার্চ মাসের শেষে চট্রগ্রাম স্টক একচেঞ্জের তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ২২৬ এবং তালিকাভূক্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্জারের পরিমান ছিল ১৭৭৬০ কোটি ট ৩৯ লক্ষ টাকা।

শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের পার্থক্য ঃ শেয়ার ও ডিবেঞ্চার মূলধন উপাদান হলেও নিজেদের মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য রয়েছে।

১। শেয়ার হোল্ডারগন কোম্পানির মালিক । পক্ষান্তরে ডিবেঞ্চার ক্রেতারা কোম্পানির ঋণদাতা।

২। শেয়ার হচ্ছে কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের উপায়। অন্যদিকে ডিবেঞ্চার হল চলতি ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে কোম্পানির ঋণ।

৩। শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানির মুনাফার ভিত্তিতে লভ্যাংশ পায় । কিন্তু ডিবেঞ্চার ক্রেতাগন ডিবেঞ্চারের জন্য পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ পায়।

৪। শেয়ার হোল্ডারগন কোম্পানির লাভ ও লোকসান দুই-ই বহন করে। কিন্তু ডিবেঞ্চার ক্রেতাগনের সঙ্গে কোম্পানির লাভ-লোকসানের কোন সম্পর্ক নেই। তারা ডিবেঞ্চারের জন্য পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ পায়।

৫। শেয়ার হোল্ডারগনের কোম্পানিতে ভোটাধিকার রয়েছে । কিন্তু ডিবেঞ্চার ক্রেতাদের তা নেই।

৬। সব ধরনের কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলোই ডিবেঞ্চার বিক্রি করতে পারে।

৭। শেয়ারের অর্থ কোম্পানি বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ফেরত দেওয়া হয় না। কিন্তু ডিবেঞ্চারের অর্থ মেয়াদান্তে ফেরত দিতে হয়।

৮। শেয়ার হচ্ছে কোম্পানির মূলধনের অংশ বিশেষ অন্যদিকে ডিবেঞ্চার হলো কোম্পানির ঋনের দলিল।

বাংলাদেশের মূলধন বাজারের সমস্যাসমূহঃ

বাংলাদেশের অন্যান্য খাতের মত মূলধন বাজার ও অনুন্নত। তদুপরি, শেয়ারের মূল্যের অস্বাভাবিক উঠানামা এবং ডিলার ও সিকিউরিটির অপ্রতুলতার কারনে দেশের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো শেয়ার বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের পরিবর্তে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহন করতে অধিকার আগ্রহী। বাংলাদেশের মূলধন বাজারের সমস্যা ও অনুন্নতির কারণসমূহ আলোচনা করা হলঃ

১। ব্যাংক ঋনের সুবিধাঃ বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহনে অধিকতর আগ্রহী । কারণ বড় বড় ব্যবসায়ীগন তাদের রাজনৈতিক প্রভাব দ্বারা ব্যাংক ঋণ খেলাপি করার সুযোগ পায়। এদেশের বড় বড় ব্যবসায়ীদের প্রায় অনেকেই ঋণ খেলাপী।

২। উন্নত অবকাঠামোর অভাবঃ বাংলাদেশের মূলধন বাজারের অবকাঠামো এখনও উন্নত হয়নি। দেশে মাত্র ২০টি স্টক একচেঞ্চের মার্কেটে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হয়। এগুলোর ব্যবস্থাপনাও অত্যন্ত নিম্নমানের । তাছাড়া কার্ব মার্কেটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ।

৩। শেয়ারের মুল্যের অস্থিরতা ঃ আমাদের দেশে শেয়ারের মূল্যসূচক খুবই অস্থির। ১৯৯৬ সালের শেয়ার বাজারের বিপর্যয়ের স্মৃতি এখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায় নি। তাছাড়া , বিভিন্ন অনিয়মের কারনে এখনও শেয়ারের মূল্যসূচকের ঘন ঘন উত্থান-পতন ঘটছে। ফলে বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে শেয়ার বাজার এখন জনপ্রিয় নয়।

৪। রাজনৈতিক অস্থিরতাঃ বাংলাদেশে এখনও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গড়ে উঠেনি। সরকার পরিবর্তনের আশংকায় অনেক সময় পূঁজি বিদেশে পাচার হয়ে যায়।

৫। সরকারি ঋনপত্রের প্রাচুর্যঃ এদেশেও সরকারি ঋনপত্রের অভাব নেই এবং এদের সুদের হার নিরাপত্তা বেশি। ফলে দেশের মানুষ সরকারি ঋণপত্রে অর্থ বিনিয়োগে অধিকতর আগ্রহী।

৬। প্রতারনার ভয়ঃ ব্যাপক জালিয়াতির কারণে কার্ব মার্কেটে শেয়ার ক্রেতাগন প্রায়ই প্রতারিত হন। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই ভয়ে কার্ব মার্কেটে শেয়ার কিনতে এগুচ্ছেনা।

বাংলাদেশে মূলধন বাজার উন্নয়নের উপায়ঃ

বাংলাদেশে মূলধন বাজার অনুন্নত । দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে আমাদের মূলধন বাজারের দ্রুত উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক। বাংলাদেশে মূলধন বাজার উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যায়।

১। সুদের হার হ্রাসঃ বাজারে সুদের হার বেশী হলে মানুষ ব্যাংকে টাকা খাটানোই অধিকতর পছন্দ করে। এতে মানুষের সঞ্চিত অর্থ মূলধন বাজার ছেড়ে মুদ্রাবাজারে প্রবাহিত হয়। সুতরাং জনসাধারণকে শেয়ার বাজারে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের সুদের হার যুক্তি সঙ্গতভাবে হ্রাস করতে পারে।

২। বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদানঃ বাংলাদেশের মূলধন বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। বিদেশি বিনিয়োগের আগমনে বাংলাদেশের শেয়ার বাজার চাঙ্গা হবে।

৩। ট্রেডিং সুবিধার সম্প্রসারণঃ আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সারাদেশে ট্রেডিং সুবিধা সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে বর্তমানে ঢাকা ও চট্রগ্রামে দুটি স্টক এক্সচেঞ্জ আছে। কিন্তু অনলাইন ট্রেডিং সুবিধার অভাবে এ দুটি স্টক একচেঞ্জ গোটা দেশের সাথে সংযুক্ত নয়। অনলাইন ট্রেডিং সুবিধার ব্যবস্থা করে দেশের বিভিন্ন শহর থেকে আমাদের স্টক একচেঞ্জগুলোকে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৪। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাঃ মূলধন বাজার উন্নয়নে জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত অপরিহার্য।

৫। প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ বর্তমানে বাংলাদেশের মূলধন বাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা নিতান্ড়ই কম। সুতরাং মূলধন বাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

৬। প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে উৎসাহ প্রদানঃ প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবিগণ যাতে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে পারেন সেলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন।

৭। সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশনের শক্তি বৃদ্ধিঃ বাংলাদেশের মূলধন বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশনকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এতে এই কমিশনের তদারকি ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

৮। বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিঃ বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত শেয়ার কেলেংকারিতে শেয়ার বাজারের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা হানি ঘটেছে। সুতরাং শেয়ার কেলেংকারির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এতে শেয়ার বাজারে প্রতি জনগনের আস্থা বাড়বে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১১.৬

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ

১. মুদ্রা বাজার ও মূলধন বাজার বলতে কি বুঝায়?
২. মুদ্রা বাজারের উপাদানসমূহ কি?
৩. শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. মুদ্রাবাজার ও মুলধন বাজারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
২. মুদ্রাবজারের উপাদানসমূহের ভূমিকা বর্ণনা করুন ।
৩. বাংলাদেশের মুদ্রাবাজারের ত্রুটিসমূহ বিশ্লেষন করুন ।
৪. বাংলাদেশের মুদ্রাবজারের উন্নয়নের উপায়গুলো উল্লেখ করুন ।
৫. বাংলাদেশের মূলধন বাজারের উপাদানসমূহের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন ।
৬. বাংলাদেশের মূলধন বাজারের সমস্যাসমূহ উল্লেখ করুন ।
৭. বাংলাদেশের মূলধন বাজারের উন্নয়নের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন ।

পাঠ-৭ : বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কার্যাবলী বিবৃত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা বিশ্লেষন করতে পারবেন।

বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ

সাধারণভাবে ব্যাংক ব্যবস্থা বলতে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থাকে বোঝায়। বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার অভিভাবকের দায়িত্বে আছে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক। নিম্নে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলঃ

১। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ঃ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ১৯৭৫ সনে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ব্যাংক ব্যবস্থার বেসরকারীকারণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ার অধীনে দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংককে বেসরকারী খাতে প্রত্যর্পণসহ বেসরকারী খাতে নতুন ব্যাংক স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়।

২। বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে ৩০টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে। এই ব্যাংকগুলোর মধ্যে ২টি বি-রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংকও রয়েছে। এগুলো হল পূবালী ব্যাংক ও উত্তরা ব্যাংক। অবশিষ্ট ২৮টি ব্যাংক সম্পূর্ণ বেসরকারী মালিকানায় স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া আরও কতিপয় বেসরকারি ব্যাংক অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

৩। বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে ১২টি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্মরত আছে। তবে এ সমস্ত বিদেশী ব্যাংকের কার্যক্রম প্রধানত ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে কেন্দ্রীভূত রয়েছে।

৪। বিশেষায়িত ব্যাংক ঃ উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে শিল্প, কৃষি ইত্যাদি খাতের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ধরণের ব্যাংকের প্রয়োজন আছে। ফলে বাংলাদেশে এ সমস্ড় খাতে ঋণদানের জন্য কতিপয় বিশেষায়িত ব্যাংক কর্মরত আছে।

৫। ইসলামী ব্যাংক ঃ ইসলামে সুদ গ্রহণ জায়েজ নয়, ইসলামী ব্যাংক সুদের পরিবর্তে মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় বলে দাবি করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে এরূপ কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক চালু করা হয়েছে।

৬। শহরকেন্দ্রীক ব্যাংক ব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা এখনও শহরকেন্দ্রীক। দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থা এখনও তেমন প্রসারিত হয়নি।

৭। শাখা ব্যাংক ব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশে ইংল্যান্ডের অনুকরণে শাখা ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এই ব্যবস্থায় একটি ব্যাংকের অনেকগুলো শাখা থাকে। আমাদের দেশে একক ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলিত নয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার অভিভাবক হিসাবে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে ঃ

১। নোট প্রচলন ঃ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে কাগজী মুদ্রা প্রচলন করে।

২। অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অপরাপর ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কাজ করে। বাংলাদেশের প্রতিটি তালিকাভূক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা ৫ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখে। প্রয়োজন হলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে অথবা প্রথম শ্রেণীর বিল ভাঙ্গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ মোতাবেক চলতে হয়।

৩। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ঃ বর্তমানে আমাদের দেশে মানি লন্ডারিং বা অবৈধ উপায়ে বিদেশি মুদ্রার অনুপ্রবেশ একটি বড় সমস্যা। এটিকে মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন- ২০০৩ প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে এই আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৪। উন্নয়নমূলক কাজ ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানাভাবে সাহায্য করে। কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হয়। এ সমস্ত ঋণের চাহিদা মিটানোর জন্য বিভিন্ন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। এছাড়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নেরর জন্য এই ব্যাংক সরকারের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রণয়ন করে।

৫। নিকাশঘর ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নিকাশঘর হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে চেকের মাধ্যমে আদান প্রদানের ফলে পরস্পরের মধ্যে যে দেনা পাওনার সৃষ্টি হয় তা মিটানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিকাশ ঘর হিসাবে কাজ করে।

৬। সরকারের ব্যাংক ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসাবে কাজ করে। সরকারের সমস্ত লেনদেন এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের সমস্ত টাকা বিনা সুদে গচ্ছিত রাখে। এই ব্যাংক সরকারকে ঋণ দেয় এবং প্রয়োজনবোধে সরকারকে আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে।

৭। ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রয়োজনের সময়ে তাদেরকে সাহায্য করা বাংলাদেশ ব্যাংকের নৈতিক দায়িত্ব। কোন ব্যাংক অসুবিধায় পড়লে বাংলাদেশ ব্যাংক সেই ব্যাংকটির বিল, হুন্ডি ক্রয় করে কিংবা অপরাপর জামানত রেখে তাকে ঋণ প্রদান করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর যখন অন্য কোথাও ঋন পাওয়ার উপায় থাকে না তখন তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বারস্থ হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এই সময় তাদেরকে সাহায্য করে থাকে।

৮। ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঃ দেশের ঋণ কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে দামস্তর স্থির রাখা সম্ভব হয় না। এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কার্যাবলির উপর দৃষ্টি রাখে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাংক ঋণ সম্প্রসারণ ও সংকোচন করতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বাধ্য করে।

৯। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশের টাকার বহির্মূল্য স্থির রাখে। দেশের অর্জিত সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখা হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সকল প্রকার লেনদেন এ ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্প মেয়াদী ঋণ নিয়ে কারবার করে। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলীকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী, (২) প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী এবং (৩) সাধারণ সুবিধামূলক কার্যাবলী। নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করা হল ঃ

১। সাধারন ব্যাংকিং কার্যাবলী ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক নিম্নোক্ত সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদন করে ঃ

ক) আমানত গ্রহণ করা ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হল ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে আমানতের আকারে একত্রিত করা। চলতি আমানতের জন্য ব্যাংক কোন রকম সুদ দেয় না। তবে সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানতের জন্য ব্যাংক সুদ প্রদান করে।

খ) ঋণদান করা ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। ব্যাংক মূল্যবান সম্পত্তি জামিন রেখে আমানতের অতিরিক্ত টাকা তোলার সুযোগ দিয়ে কিংবা বিনিময় বিল সই করে ঋণ দেয়। তদুপরি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও সরকারি ঋণপত্র ক্রয় করেও ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।

গ) বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রাথমিক আমানত থেকে বহুগুণ বেশী যখন সৃষ্টি করে তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকের এই সৃষ্ট আমানত চেকের মাধ্যমে হস্তান্তর যোগ্য হয়। সুতরাং নোট প্রচলন করতে না পারলেও ব্যাংকের আমানতের দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

ঘ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা করা ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যাংক ড্রাফটের মারফত এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা প্রেরণ করে। এছাড়া বিনিময় বিলের ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমেও বাণিজ্যিক ব্যাংক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের দেনা পাওনার হিসেব মিটিয়ে দেয়।

২। প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী ঃ ব্যাংক মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন কাজ করে তাকে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক) মক্কেলদের প্রতিনিধিরূপে ব্যাংক শেয়ার ক্রয় করে। বাজারের অবস্থা সম্পর্কে ভালরূপে জানতে পারে বলে ব্যাংক এই কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে।

খ) ব্যাংক মক্কেলদের পক্ষে চেক সংগ্রহ করে, বিলের উপর স্বাক্ষর দান এবং তা সংগ্রহ করে।

গ) ব্যাংক মক্কেলদের প্রতিনিধিরূপে ইনসিউরেন্স এর প্রিমিয়াম দেয়, আয়করের হিসাব দাখিল করে এবং পেনশনের টাকা, ব্যবসায়ের লভ্যাংশ, মূলধনের সুদ ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

ঘ) ব্যাংক অনেক সময় বিনিময় বিল ক্রয় করে এবং তা ভাঙ্গিয়ে বাট্টা আদায় করে।

ঙ) ব্যাংক মক্কেলদের হিসাবপত্র সংরক্ষণ করে এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে।

চ) ব্যাংক মক্কেলদের অছি (Trustee) হিসাবে তাদের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করে।

৩। সাধারণ সুবিধামূলক কার্যাবলী ঃ প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী ছাড়াও ব্যাংক মক্কেলদের সাধারণ ও নিরাপত্তামূলক সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে কতিপয় কার্যাবলী সম্পাদন করে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক) ব্যাংক দলিল পত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করে।

খ) ব্যাংক মক্কেলদের আর্থিক অবস্থা ও ব্যবসায়ের সুনাম সম্পর্কে সার্টিফিকেট প্রদান করে।

গ) ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত লেনদেন নিষ্পত্তি করে।

ঘ) কোন ব্যবসায়ীর নিকট কত টাকা পর্যন্ত ধারে পণ্য বিক্রি করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ব্যাংক মক্কেলকে যে চিঠি দেয় তাকে লেটার অব ক্রেডিট বলে। এটি আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অত্যন্ড়প্রয়োজনীয়।

ঙ) দূর দেশে ভ্রমনকারীদের ব্যাংক এক বিশেষ ধরণের চেক ব্যবহার করতে দেয়। একে ভ্রমণকারীর (Travellers Cheque) বলে।

চ) আমানতকারীদের অনুরোধে ব্যাংক তাদেরকে বিবিধ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার সমস্যা ও ত্রুটিসমূহ ঃ

দেশে সুষ্ঠু ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়াত্ত করা হয়। পরবর্তীতে আবার বেসরকারী খাতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ফলে বর্তমানে আমাদের ব্যাংক ব্যবসায়ে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক পাশাপাশি কাজ করছে। নিম্নে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

১। প্রতিযোগিতার অভাব ঃ সুষ্ঠু ব্যাংক ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকা বাঞ্চনীয়। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে প্রতিযোগিতার অভাব রয়েছে। ফলে বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন হারে আমানতের উপর সুদ প্রদান ও অগ্রিমের জন্য সুদ আদায় করে।

২। কৃষি ঋণের অভাব ঃ কৃষির উপর আমাদের অর্থনীতি নির্ভরশীল হলেও আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কৃষিক্ষেত্রে ঋণদানের ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব আরোপ করে না। এতে আমাদের কৃষির উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

৩। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রাধান্য ঃ বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা মাত্র চারটি হলেও দেশের ব্যাংক ব্যবসায়ের সিংহভাগ এই চারটি ব্যাংকের করায়ত্ত রয়েছে। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক খাতে আমানত ও অগ্রীমের ৫০ শতাংশের অধিক এই চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে রয়েছে। এ ধরণের অবস্থা দেশে প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংক ব্যবসায়ের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

৪। আমলাতন্ত্র ঃ বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সমূহ আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত রয়েছে। বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর অবস্থাও অনেকটাই তাই।

৫। সংগঠিত বিলের বাজার নেই ঃ আমাদের দেশে সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ বিলের বাজার নেই। এতে ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অসুবিধায় পড়তে হয়।

৬। দক্ষ কর্মচারীর অভাব ঃ ব্যাংক ব্যবসায়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সুদক্ষ কর্মচারী একান্ত আবশ্যক। ব্যাংক কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। ফলে দক্ষ কর্মচারীর অভাবে আমাদের ব্যাংক ব্যবস্থা পরিচালনা ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

৭। ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা ঃ প্রয়োজনের তুলনায় বাংলাদেশে ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলোরও অভাব রয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি খাতে ব্যাংক স্থাপিত হলেও এদের কার্যক্রম প্রধানত শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।

৮। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণের অভাব ঃ আমাদের দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরণের ঋণদানে তেমন আগ্রহী নয়। কারণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরণের ঋণ গ্রহীতারা উত্তম জামানত প্রদান করতে পারে না। বর্তমানে সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৯ । ব্যাংকিং অভ্যাসের অভাবঃ বাংলাদেশের জনগনের মধ্যে এখনও ব্যাংকিং অভ্যাস গড়ে উঠেনি। জনগন এখনও নগদ টাকায় লেনদেন পছন্দ করে । সহজে তারা ব্যাংকে যেতে চায়না । এতে আমাদের ব্যাংক ব্যবসায়ের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

১০। অকার্যকর ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দেশের অর্থের যোগান কাম্যস্তরে রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বাংলাদেশের মুদ্রাবাজার অনুন্নত বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রনের হাতিয়ারগুলো খুব একটা কার্যকর নয়।

১১। শহর কেন্দ্রীক ব্যাংক ব্যবস্থাঃ বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থা এখনও শহরকেন্দ্রীক। দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এখনও ব্যাংক ব্যবস্থা প্রসারিত হয়নি। অথচ এ দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বাস করে।

১২। খেলাপি ঋণঃ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ এক মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বেসরকারি ব্যাংকের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে এ সমস্যার পরিমান বেশি। ব্যবসায়িরা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কিংবা এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ন ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগসাজসে বিপুল পরিমান ঋণ গ্রহন করে। কিন্তু সময়মত ঋন ফেরত দেয় না । বাংলাদেশে খেলাপি ঋনের পরিমান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের জন্য যে বিপুল পরিমান মূলধনের প্রয়োজন তা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন সঞ্চয় থেকে মেটানো সম্ভব হয় না। ফলে বাংলাদেশের কতিপয় খাতের উন্নয়নের জন্য এই সমস্ত বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্ব ও ভূমিকা আলোচনা করা হলঃ

১। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষকদের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে । সার, বীজ কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতির জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয়। অন্যদিকে, দামি যন্ত্রপাতি ক্রয়, গভীর – অগভীর নলকুপ স্থাপন ও জমির স্থায়ী উন্নতি বিধানের জন্য কৃষি ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে । বর্তমানে কৃষি ব্যাংকের ঋণদান পদ্ধতির খানিকটা উন্নতি হয়েছে এবং ব্যাংকের ঋনের পরিমানও বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি ব্যাংক বর্তমানে গতানুগতিক কৃষি কাজ ছাড়াও মাছের চাষ, হাঁস- মুরগির খামার এবং আলু, আনারস, পান ও কলার চাষে ঋণ প্রদান করছে।

এছাড়াও বিগত কয়েক বছর যাবৎ কৃষি ব্যাংক সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের মত ব্যাংকিং কার্যাবলিও সম্পাদন করছে।

২। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ঃ দ্রুত শিল্প উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনেতিক উন্নয়নের জন্য খুবই জরুরী। এই উদ্দেশ্যে শিল্পখাতে মূলধন যোগানের জন্য বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিল্প ব্যাংক নতুন শিল্প স্থাপন ও পুরাতন শিল্পের আধুনিয়ীকরনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে ঋণ প্রদান করে। শিল্প ব্যাংক স্থানীয় ও বৈদেশিক উভয় প্রকার মুদ্রা ঋণ দিয়ে থাকে । তদুপরি শিল্প ব্যাংক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্টক, ডিবেঞ্চার , ঋনপত্র প্রভৃতি ইস্যু করার ব্যাপারে দায় গ্রহন করে এবং ইকুইটি চাহিদা মিটানোর জন্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করে । এছাড়া শিল্প ব্যাংক শিল্প প্রতিষ্ঠানের চলতি মূলধরনের চাহিদা মিটানোর জন্য স্বল্প মেয়াদি ঋণও সরবরাহ করে। শিল্প ব্যাংক তার সাহায্য প্রাপ্ত শিল্পগুলোর পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন , সাধারণ প্রশাসন ইত্যাদি ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করে থাকে। এছাড়া এই ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের মত সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে। ২০০৯ সনের মার্চ মাস শেষে শিল্প ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋনের পরিমান ছিল ৩৬৪৭ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। প্রদত্ত ঋনের অধিকাংশই দীর্ঘমেয়াদী ঋন। অতএব এদেশের শিল্প উন্নয়নে শিল্প ব্যাংকের অবদান উল্লেখযোগ্য তবে শিল্প ব্যাংকের ঋনের সিংহভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

৩। বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ঃ বৃহদায়তন শিল্পে ঋন দানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা গঠন করা হয়। এই ব্যাংক নিজস্ব পোর্টফোলিও ভূক্ত শিল্প প্রকল্পগুলোর সুসমকরন, আধুনিকীকরন ও সম্প্রসারনের জন্য আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রাখে ও সমস্যাপীড়িত প্রকল্পসমূহের পূনবার্সন ও পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে। এই সংস্থার ঋণদান কার্যক্রম বেসরকারি খাতে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

৪। বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা ঃ বাংলাদেশে গৃহ নির্মান ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য এই ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে। এই সংস্থা দেশের বড় বড় শহর, নগর, উপজেলা সদর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আবাসিক বাড়ি নির্মাণ, মেরামত ও আধুনিকীকরনের জন্য ঋণ প্রদান করে। তাছাড়া এই সংস্থা বহুতল বিশিষ্ট ফ্ল্যাটবাড়ি নির্মাণ ও ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে।

৫। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশঃ বাংলাদেশের মূলধন বাজার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ স্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশের মূলধনবাজার এখনও খুবই অনুন্নত। বাংলাদেশে দুটি মাত্র স্টক একচেঞ্জ আছে। ঢাকা স্টক একচেঞ্জের কার্যক্রম ১৯৭৬ সাল থেকে শুরু হয়েছে। অন্যদিকে , চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের এখনও শিশুকাল অতিক্রান্ত হয়নি। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে মূলধন বাজারের উন্নয়নে ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬। গ্রামীন ব্যাংক ঃ পল্লী অঞ্চলে ভূমিহীন কৃষকদেরকে ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রামীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামীন ব্যাংক দেশের ভূমিহীন কৃষকদের জন্য সহজশর্তে ও জামানত ছাড়া ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। জামানতের অভাবে ভূমিহীন কৃষকেরা দেশের প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানমূহ থেকে ঋণ পায় না। এ সমস্ত দারিদ্র্য পীড়িত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদানের জন্যই গ্রামীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ব্যাংকের ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার রয়েছে। এ ব্যাংকের খেলাপি ঋণ নেই বললেই চলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১১.৭

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন ।
২. কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করুন ।
৩. বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কার্যাবলী বিশ্লেষন করুন ।
৪. বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ উল্লেখ করুন ।

৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহের ভুমিকা বিশ্লেষণ করুন ।

পাঠ-৮: বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবকাঠামো

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থ–সামাজিক অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের উপায় চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের বাসস্থান সমস্যা সমাধানে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বিশ্লেষন করতে
- পারবেন।
- বাংলাদেশের শিক্ষা উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বিবৃত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করতে পারবেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলতে কি বোঝায়?

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং তাকে গতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাঁধ ও সেতু, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কতিপয় মৌলিক সুযোগ সুবিধার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ সমস্ত অপরিহার্য উপাদানকে অবকাঠামো বলে। এদের উপস্থিতি ছাড়া উন্নয়ন অগ্রসর করা যায় না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়েই এ সমস্ত উপাদান গড়ে তোলা হয় এবং এদের উপর ভিত্তি করেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের যাত্রা আরম্ভ হয়। এ অবকাঠামোকে প্রচলিত ভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) সামাজিক অবকাঠামো, (খ) অর্থনৈতিক অবকাঠামো।

১। সামাজিক অবকাঠামো ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কতিপয় সামাজিক উপাদানের উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য। জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত বিষয় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার আচরণকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও দেশের উন্নয়নের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে। অতএব, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর প্রভাব বিস্তারকারী এ সমস্ড় সামাজিক উপাদানগুলোকে সামাজিক অবকাঠামো বলে।

২। অর্থনৈতিক অবকাঠামো ঃ উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সেচ ব্যবস্থা, বাঁধ ও সেতু, শক্তি সম্পদ প্রভৃতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি। বস্তুত এগুলো ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এগুলোকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলে। অতএব, যে সমস্ত অর্থনৈতিক উপাদান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে এবং যাদের অনুপস্থিতিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হয় না, এককথায় তাদেরকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা ঃ

নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থ–সামাজিক অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল ঃ

১। দক্ষ জনশক্তি ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম ও প্রধান উপাদান হল দক্ষ জনশক্তি।তাই দেশের জনগোষ্ঠিকে জনশক্তিতে রুপান্তরের লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে।

২। কৃষি উন্নয়ন ঃ কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব রয়েছে। পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হলে কৃষি উন্নয়নের জন্য সার, বীজ ইত্যাদি উপকরণ সরবরাহ ও কৃষিজাত পণ্য শহরের বাজারে প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়।

৩। শিল্পোন্নয়ন ঃ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হলে অতি সহজে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল শিল্পকেন্দ্রে এবং কারখানায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারে পাঠান সম্ভব হয়।

৪। বিদ্যুৎ উৎপাদন ঃ দেশের উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করতে হলে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন একান্ত আবশ্যক।

৫। দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা ঃ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সহজে উৎপাদিত পণ্য আনা নেয়া করা যায়। ফলে কোথায়ও কোন দ্রব্যের ঘাটতি সৃষ্টি হয় না। এতে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল হয়। মূল্যের স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক।

৬। বাজারের আয়তন ঃ বাজারের আয়তন দেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অভ্যন্ড়রীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এতে পণ্যের বাজার বিস্তৃত হয় এবং উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

৭। তথ্যের আদান-প্রদান ঃ ডাক, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, ভূ-উপগ্রহ, টেলেক্স, বেতার ও টেলিভিশন প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম। বর্তমান যুগ হল তথ্য আদান-প্রদানের যুগ। বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদ এর আদান প্রদান অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে। সুতরাং, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একান্ত আবশ্যক।

৮। মাত্রাগত ব্যয়-সংকোচ ঃ দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নত হলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য মাত্রাগত ব্যয় সংকোচের সুবিধা সৃষ্টি হয়। এতে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্প্রসারণ ঘটে ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৯। জনস্বাস্থ্য ঃ স্বাস্থ্যহীন জনগোষ্ঠী দেশের উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে উন্নত স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য।

১০। শ্রমের গতিশীলতা ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শ্রমের গতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। শ্রমের গতিশীলতার জন্য যেমন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে শ্রমিক পেতে সুবিধা হয় তেমনি শ্রমিকদের কর্ম নিয়োগের পথও প্রশস্ত হয়। শ্রমের গতিশীলতা একান্ড়ভাবেই দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশের যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ

বাংলাদেশের যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরুপ ঃ

১। অনুন্নত যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশের যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত ও প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। বাংলাদেশে মাত্র ৩৮০০ কিলোমিটার জনপথ, ২৮৩৫ কিলোমিটার রেলপথ ও ২০৯৪৮ কিলোমিটার সড়কপথ রয়েছে। এটি আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলই রেলপথের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এছাড়াও আমাদের সড়কপথেরও অধিকাংশ কাঁচা, অনুন্নত ও যানবাহন চলাচলের অনুপযুক্ত। জলপথের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজমান। কয়েকটি নদী বন্দর ছাড়া দেশের গ্রামাঞ্চলে জলপথে যাতায়াতের আধুনিক ব্যবস্থা নেই।

২। যানবাহনের অভাব ঃ বাংলাদেশে যানবাহনের প্রচন্ড অভাব রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদের যানবাহন ব্যবস্থার প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ঐ সময় আমাদের বহু রেল ইঞ্জিন, বগি, ষ্টীমার, লঞ্চ ও জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। তাই স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ যানবাহনের ক্ষেত্রে এক সংকটময় পরিস্থিতিতে পড়ে। বর্তমানে এ অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও যাতায়াত ব্যবস্থা আমাদের দেশে অত্যন্ড় ব্যয়সাপেক্ষ।

৩। যোগাযোগ ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা ঃ বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত। রেলপথ, জলপথ ও সড়ক পথে নিয়মানুবর্তিতার বালাই নেই, দূর্ঘটনা অহরহই ঘটছে।

৪। যাতায়াত ব্যবস্থার মালিকানা ঃ বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি দু'রকমের মালিকানাই বিদ্যমান।

৫। ঋতুভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। বর্ষাকলে জলপথই আমাদের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের উপায় ঃ

আমাদের পরিবহন ব্যবস্থায় সড়ক পরিবহন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন একান্ড় আবশ্যক। দেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে।

১। সড়ক প্রশস্তকরণ ঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ সড়কপথ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রশস্ত হওয়ার কারণে যানজট সৃষ্টি হয়। আমাদের জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কগুলোর প্রশস্ততাও অনেক জায়গায় প্রয়োজনের তুলনায় কম। এতে যাত্রাপথে অহেতুক বিলম্ব হয়। সুতরাং জরুরী ভিত্তিতে দেশে সড়ক প্রশস্তকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার।

২। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের অভাবেও আমাদের রাস্তাঘাটে যানজটের সৃষ্টি হয় এবং দূর্ঘটনা ঘটে। এ সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে আমাদের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও উন্নত করা দরকার।

৩। ফ্লাই ওভার নির্মাণ ঃ ফ্লাই-ওভারের অভাবে সড়ক পথে ক্রস রোডগুলোতে প্রায়ই প্রচন্ড যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত স্থানে ফ্লাই-ওভার নির্মাণ করে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।

৪। কালভার্ট নির্মাণ ঃ আমাদের সড়ক পথে পর্যাপ্ত পরিমাণে কালভার্ট নেই। এতে অনেক সময় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। সুতরাং দেশের সড়কপথে পর্যাপ্ত পরিমাণে কালভার্ট নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। যানবাহনের মান উন্নয়ন ঃ বর্তমানে আমাদের সড়কপথে চলাচলকারী অনেক যানবাহনই ত্রুটিপূর্ণ। এটি দেশের সড়ক দূর্ঘটনার অন্যতম কারণ। সুতরাং যানবাহনের মান নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত আবশ্যক।

৬। ভাড়া নিয়ন্ত্রণ ঃ বর্তমানে বাস ও ট্রাক মালিক সমিতিগুলো তাদের ইচ্ছামত ভাড়া আদায় করে। সুতরাং সড়কপথে বিভিন্ন যানবাহনের ভাড়া সরকার কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

৭। সেতু নির্মাণ ঃ নদীমাতৃক বাংলাদেশে সড়ক পথে প্রচুর সেতুর প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের অনেক নদীতে সেতু না থাকায় সেখানে ফেরীর ব্যবস্থা করতে হয়। সুতরাং দেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে সেতু নির্মাণ একান্ড় আবশ্যক। যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের পর উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের এটি বাধা অপসারিত হয়েছে।

৮। বেসরকারী খাতে সড়ক নির্মাণ ঃ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দেশের সড়ক অবকাঠামো নির্মাণে বেসরকারী খাতকেও সম্পৃক্ত করা দরকার। এদেশে সড়ক নির্মাণ খুবই ব্যয়সাধ্য। কাজেই শুধুমাত্র সরকারিভাবে দেশের সকল রাস্ড়ঘাট নির্মাণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং উপযুক্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সড়ক অবকাঠামোতে নির্মাণে দেশের বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা উচিত।

বাসস্থান সমস্যা সমাধানে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ঃ

জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় পাঁচটি মৌলিক উপাদানের মধ্যে বাসস্থান একটি। জনবহুল এদেশের নানাবিধ সমস্যার সাথে বর্তমানে বাসস্থান সমস্যা সমাধানে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেঃ

১। গৃহায়ন তহবিল গঠণ ঃ দেশের গ্রামীণ গৃহহীন পরিবারের বাসস্থান সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিকভাবে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ৫০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে একটি গৃহায়ন তহবিল গঠণ করে। বর্তমানে বাজেট বরাদ্দ ও সুদসহ তহবিলের পরিমাণ ২০৮.৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ফেব্রুয়ারী ২০১০ পর্যন্ত এই তহবিলের আওতায় মোট ৪৭৫৭৫টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে যাতে সুবিধা ভোগীর সংখ্যা ২.৩৮ লক্ষ জন।

২। আশ্রয় প্রকল্প ঃ সরকার ৭১৫.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৯ সাল হতে পুনরায় আশ্রায়ন প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৬৫ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১০ সালের জুন মাসে এই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ১২১৫.০৭ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য্য করে আশ্রায়ন- ২ প্রকল্প গ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩। একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প ঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়ীকে অর্থনৈতিক কার্যাবলী কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রতিটি গ্রামকে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১১৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের অধীনে ৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

৪। ঘরে ফেরা কর্মসূচী ঃ বস্তিতে মানবেতরভাবে বসবাসকারী ছিন্নমূল মানুষকে নিজ এলাকায় ফিরিয়ে নিয়ে বিভিন্ন উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এই কর্মসূচীর আওতায় ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ঃ

বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে শিক্ষা খাতের উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে শিক্ষাখাতে মোট ৪১৫২.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন করে মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সকলের জন্য শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলঃ

১। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ঃ দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ১৯৯০ সনে জাতীয় সংসদে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন- ১৯৯০ পাশ হয় এবং ১৯৯৩ সাল হতে সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়।

২। কর্মজীবি শিশু-কিশোরদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে কর্মজীবি শিশু ও কিশোরদের শিক্ষা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার জুলাই- ২০০৪ সালে ২০৬ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

৩। উপবৃত্তি কার্যক্রম ঃ সরকার শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য ২০০৮-২০১৩ সাল মেয়াদী একটি উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় একটি দরিদ্র পরিবারের সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য ১২৫ টাকা হারে মাসিক উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।

৪। বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম ঃ যে সমস্ত শিক্ষা বঞ্চিত নারী-পুরুষ, গণশিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় স্বাক্ষর জ্ঞান লাভ করেছে, তাদের অর্জিত শিক্ষাকে আরো বর্ধিত করা এবং তাদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'স্বাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প- ১' গ্রহণ করেছে।

৫। সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম ঃ সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জুলাই, ২০০৪ সাল হতে জুন, ২০১০ সাল মেয়াদী একটি প্রকল্প সরকার গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯০.৭২ কোটি টাকা। সুবিধা বঞ্চিত ৭-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিকরণ, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, প্রকল্পের আওতাধীন স্কুলসমূহের ছাত্রদের জন্য শিক্ষাভাতা প্রদান ইত্যাদি এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৬। নারী শিক্ষার প্রসার ঃ নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে সরকার দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ করেছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সরকার প্রতিবছরই বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০১০ সালে ৭.৮০ কোটি পাঠ্যপুস্ড়ক বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ঃ

চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ বেশী কার্যকর এবং অর্থনৈতিকভাবে বেশী লাভজনক। এ শ্লোগানকে সামনে রেখে সরকার জনগণকে মানসম্পন্ন সেবা প্রদান করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচীসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত সম্পর্কিত কর্মসূচী ঃ দেশের সকল জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ২০০৩-২০১১ সাল মেয়াদী একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচীর উন্নয়ন খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৭৩৮৪.১১ কোটি টাকা।

২। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঃ এ লক্ষ্যে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ঃ

ক) দেশের প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে- ক্সের শাখা সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ।

খ) গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছেদেয়ার লক্ষ্যে সরকার ১০২০টি কমিউনিটি ক্লিনিক গঠণ করেছে।

গ) ডেঙ্গু, সোয়াইন ফ্লু রোধে সরকার মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ঘ) সেবার মান উন্নয়নের লক্ষে ১০টি নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট ও ৩টি নার্সিং কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। ধূমপান নিয়ন্ত্রণ ঃ সরকার ধূমপান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন- ২০০৫ নামক একটি আইন প্রণয়ন করেছে। ধূমপান নিয়ন্ত্রণ ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যেই এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪। স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র সেবা পরিদপ্তর গঠণ করা হয়েছে। আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ে দেশের স্বাস্থ্য সেবার মান নিশ্চিত করতে সরকার ২০২০ সালের মধ্যে দেশে রেজিষ্টার্ড নার্সের সংখ্যা ৩৩ হাজারে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৫। ঔষধ শিল্পের উন্নয়ন ঃ এক হিসেব অনুযায়ী আমাদের দেশীয় চাহিদার ৯৭ ভাগেরও বেশী ঔষধ দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। ২০০৯ সালে স্থায়ীভাবে প্রস্তুত ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল বিশ্বের ৭৩টি দেশে রপ্তানি করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বছরে ৬০০ কোটি টাকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উৎপাদন করছে।

৬| HIV প্রতিরোধ ঃ HIV রোগের প্রাদুর্ভাব হতে দেশকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় এইডস নীতি প্রণয়ন করেছে এবং এ রোগের বিস্তার রোধকল্পে এইচপিএসপি'র আওতায় HIV/AIDS Prevention কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১১.৮

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ব্যাখ্যা করুন।
২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থ–সামাজিক অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষন করুন।।
৩. বাংলাদেশের যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।।
৪. বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।।
৫. বাংলাদেশের বাসস্থান সমস্যা সমাধানে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো মূল্যায়ন করুন।।
৬. বাংলাদেশের শিক্ষা উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো মূল্যায়ন করুন।।
৭. বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করতে পারবেন।